জুল ভার্ন

নাইজারের বাঁকে

রূপান্তর: শামসুদ্দীন নওয়াব

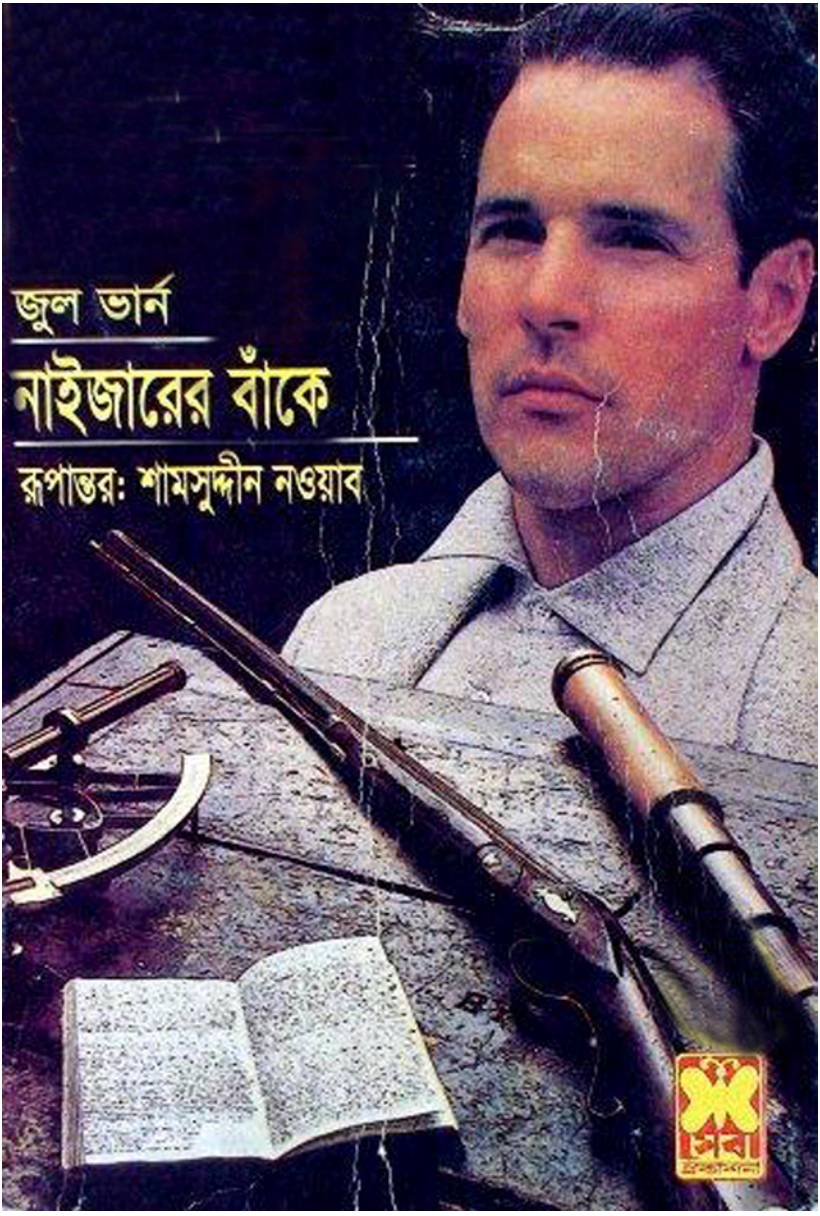

সেবা প্রকাশনী

জুল ভার্ন

শামসুদ্দীন নওয়াব

নাইজারের বাঁকে

গভীর রাতে প্রচণ্ড গোঁ-গোঁ শব্দে কি যেন উড়ে যায় মাথার ওপর দিয়ে। এসব কিসের আলামত?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

নাইজারের বাঁকে

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮২

এক

শহরের সবক'টা দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হলো খবরটা। সেন্ট্রাল ব্যাংকে দুঃসাহসিক ডাকাতি। সাঙ্ঘাতিক ঘটনাটা ঘটল স্টক এক্সচেঞ্জের কাছে থ্রেডনীডল স্ট্রীটের কোণে সেন্ট্রাল ব্যাংকের ডিকে ব্রাঞ্চে। ম্যানেজার লুই রবার্ট ব্লেজন, বিখ্যাত লর্ড ব্লেজনের ছেলে।

বিশাল একটা ঘরকে ভাগ ভাগ করে নিয়ে এই ব্যাংক। ওক কাঠের কাউন্টার। কাঁচের দরজা দিয়ে ঢুকলেই চোখে পড়বে বাঁদিকে লোহার গরাদ দিয়ে ঘেরা স্ট্রংরুম। এর পেছনেই ম্যানেজারের রুম। তারপর একটা গলিপথ। বড় হলঘরে গিয়ে শেষ হয়েছে পথটা। থ্রেডনীডল স্ট্রীটে বেরিয়ে যাওয়া যায় এখান থেকে। হলঘর থেকে বেরোনোর দরজাটাও ডবল কাঁচের।

সেদিন, পাঁচটা বাজতে বিশ মিনিট বাকি। ম্যানেজার ছাড়া ব্যাংকের কর্মচারী সংখ্যা ছয়। দু'জন ছুটিতে আছে। তিনজন মক্কেলের সঙ্গে কথা বলছে। একমনে বসে টাকা গুনছে ক্যাশিয়ার। সারাদিনে জমা পড়া টাকার হিসেব করছে। মোট জমার পরিমাণ ৭২,০৭৯ পাউন্ড ২ শিলিং ৪ পেন্স।

মিনিট কুড়ি পরেই বন্ধ হয়ে যাবে ব্যাংক। নামিয়ে দেয়া হবে স্টীলের শাটার।

নভেম্বর। ব্যাংকের কাঁচের দরজায় গোধূলির আভা। রাস্তা থেকে ভেসে আসছে ক্লান্ত বাড়ি ফেরতা অফিস কর্মচারীদের কলরব আর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যাওয়া যানবাহনের আওয়াজ। হঠাৎই এই সময় খুলে গেল ব্যাংকের ডবল কাঁচের সুইংডোর।

ভেতরে এসে ঢুকল একজন লোক। চকিতে ভেতরের আবহাওয়াটা একবার পর্যবেক্ষণ করেই ঘুরে দাঁড়াল। ডান হাত তুলল। তিনটে আঙুল সোজা করে ইঙ্গিত করল, 'তিন'। কাকে যেন বোঝাল, কাউন্টারে মোট তিনজন কর্মচারী উপস্থিত। লোকটার ইঙ্গিত ক্লার্কেরা দেখতে পেল কিনা, কিংবা দেখলেও আদৌ বুঝল কিনা, তা নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই আগন্তুকের, এমনি বেপরোয়া।

ইঙ্গিত শেষ করেই দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এসে মক্কেলদের পেছনে দাঁড়াল আগন্তুক। যেন সে-ও আর একজন মক্কেল।

লম্বা, মজবুত গড়ন এই অদ্ভুত লোকটার। কঠিন মুখ। চোখে দৃঢ় সংকল্পের ছায়া। রোদে পোড়া চামড়ার সঙ্গে দাড়ির রঙ মিশে গেছে। গলা থেকে পায়ের গোড়ালির ওপর নেমে এসেছে সিল্কের লম্বা ডাস্টকোট।

আগে আসা মক্কেলদের একে একে বিদেয় করে আগন্তুকের দিকে তাকাল একজন ক্লার্ক। শেষ মক্কেলটি দরজা খুলে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম আগন্তুকের মতই দেখতে আর একটি লোক এসে ঢুকল ঘরে। এর গায়েও একই

ধরনের লম্বা ডাস্টকোট। এগিয়ে এসে আর একজন ক্লার্কের সামনে দাঁড়াল।

তৃতীয় আরও একজন লোক এসে ঢুকল পনেরো সেকেন্ড পরই। এর গায়েও ডাস্টকোট, কিন্তু এ প্রথম দু'জনের মত লম্বাদেহী নয়। বেঁটে, গাঁট্টাগোঁট্টা। কালো দাড়ি।

আধ মিনিট পর ঢুকল আরও দু'জন লোক। দু'জনেরই পরনে ধূসর ওভারকোট। আশ্চর্য! বছরের এই সময়ে এই শহরে ওভারকোট পরে না লোকে। চেহারার রঙ ব্রোঞ্জের মত। দাড়িগোঁফে ঢেকে আছে গালমুখ। ঘরে ঢোকার কায়দাটা কিন্তু ভারি অদ্ভুত এই দু'জনের। লম্বা, হারকিউলিস মার্কা আগের লোকটা দরজা ঠেলে ঢুকতেই, পেছন পেছন দ্বারপথে এসে দাঁড়াল অন্য লোকটা। তারপর হাতলে কোট আটকে যাবার ভান করে ওটা ছাড়িয়ে নিতে গেল। আসলে এই সুযোগে কাঁচের দরজার এপাশ থেকে ঝোলানো 'ওপেন' লেখা বোর্ডটা উল্টে 'ক্লোজড' করে দিল। পাঁচটা বেজে গেছে। এই লেখা দেখে এখন আর কেউ সন্দেহ করবে না।

পাঁচজনের মধ্যে চারজন ক্লার্কদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। হারকিউলিস মার্কা লোকটা দেখা করতে চাইল ম্যানেজারের সঙ্গে।

'এক মিনিট, প্লীজ,' একজন ক্লার্ক বলল। তাড়াতাড়ি ম্যানেজারের কাছে চলল সে।

আধ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে হারকিউলিসকে নিয়ে চলল ম্যানেজারের ঘরে। দরজা খুলে লোকটাকে ঘরে ঢোকার পথ করে দিয়ে সরে দাঁড়াল। লোকটা ঢুকে যেতেই আবার ফিরে এল কাউন্টারের পেছনে, আগের জায়গায়।

কি কথাবার্তা হলো ম্যানেজারের সঙ্গে হারকিউলিসের, কেউ জানল না। ঠিক দু'মিনিটের মাথায় ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে এল লম্বু। ক্যাশিয়ারকে জানাল, তাকে ডাকছে ম্যানেজার।

একটা ব্রীফকেস আর তিনটে লেবেল লাগানো প্যাকেটে সারাদিনের জমা পড়া টাকা নিয়ে স্ট্রংরুমে গিয়ে ঢুকল আগে ক্যাশিয়ার। জায়গামত রেখে বেরিয়ে এসে প্রথমে দরজা বন্ধ করল। তারপর স্টীলের গরাদগুলো ঠেলে দরজার ওপর নিয়ে এসে ইয়া বড় বড় তালা আটকে দিল। বারকয়েক টেনেটুনে তালাগুলো ঠিকমত লেগেছে কিনা পরীক্ষা করে দেখে, সন্তুষ্ট হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। চলল ম্যানেজারের ঘরে।

এতক্ষণ ম্যানেজারের ঘরের দরজার বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ক্যাশিয়ারের কাজকর্ম দেখছিল হারকিউলিস। লোকটা এগিয়ে আসতেই পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল, তারপর পেছন পেছন এসে ঢুকল ম্যানেজারের ঘরে।

ঢুকেই কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ক্যাশিয়ার। কোথায় ম্যানেজার? ফাঁকা ঘর! রহস্য যে কি, ভাবারও সময় পেল না ক্যাশিয়ার। প্রচণ্ড জোরে তার গলা চেপে ধরল হারকিউলিস। টুঁ শব্দটি করতে পারল না সে, জ্ঞান হারাল। তার মুখে ন্যাকড়া গুঁজে দিল হারকিউলিস, তারপর কোটের পকেট থেকে দড়ি বের করে হাত-পা বেঁধে ফেলল।

তিনজন ক্লার্কের কেউ জানল না, ম্যানেজারের ঘরে কি পরিণতি ঘটল

ক্যাশিয়ারের।

আস্তে করে দরজার পাল্লা একটু ফাঁক করল হারকিউলিস। খুক খুক করে কাশল। চার সঙ্গী বুঝল, ওদিককার কাজ শেষ। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন ঝাঁপিয়ে পড়ল তিন ক্লার্কের ওপর। আধ মিনিটের মধ্যেই জ্ঞান হারাল তিনজন ক্লার্ক। মুখে ন্যাকড়ার ডাস্টার গুঁজে দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলা হলো ওদেরও।

লম্বা লম্বা পায়ে ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে এল হারকিউলিস। মাটিতে পড়ে থাকা ক্লার্ক তিনজনের দিকে একবার চেয়েই আদেশ দিল, 'শাটার নামাও।' গম গম করে উঠল গলা।

শাটার নামাতে ছুটল তিনজন। হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোন। ম্যানেজারের ঘরে।

'থামো!' আবার আদেশ দিল হারকিউলিস। ওদিকে অর্ধেক নামানো হয়ে গেছে শাটার। মাঝপথেই থেমে গিয়ে ফিরে চাইল তিন ডাকাত।

এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল হারকিউলিস, 'হ্যালো!'

'কে, ব্লেজন নাকি?'

'বলছি।'

'গলাটা অচেনা ঠেকছে যে?'

'লাইন খারাপ।'

'কিন্তু আমার এদিকে তো ঠিকই আছে মনে হচ্ছে।'

'এদিকে খারাপ। আপনাকেও তো চিনতে পারছি না আমি।'

'বলেন কি, অ্যাঁ! আমি লিওনার্ড।'

'ও, তাই নাকি? অথচ আপনাকে চিনতে পারলাম না। নাহ্ এই টেলিফোনগুলো নিয়ে আর পারা গেল না!' বিরক্তি হারকিউলিসের গলায়।

'তা, ভ্যান পৌঁছেছে?'

'কই, না তো!'

'ঠিক আছে। পৌঁছলেই "এস" ব্র্যাঞ্চে পাঠিয়ে দেবেন। এইমাত্র ফোন করেছিল ওরা। মোটা টাকা নাকি জমা পড়েছে ওখানে।'

'দেব। হ্যাঁ, তা কেমন জমা পড়েছে?'

'বিশ হাজার পাউন্ড।'

'ওরেব্বাব্বা, তাই নাকি! ঠিক আছে, ভ্যান এলেই পাঠিয়ে দেব।'

'গুড! রাখি?'

'আচ্ছা।'

ওদিকে লাইন কেটে যেতেই রিসিভার নামিয়ে রাখল হারকিউলিস। কি ভাবল এক সেকেন্ড। তারপর সঙ্গীদের হুকুম দিল, 'ক্যাশিয়ারের গা থেকে জামাকাপড় খুলে আনো। জলদি।'

ক্যাশিয়ারের জামাকাপড় দ্রুত পরে নিল হারকিউলিস। গায়ে ঠিক লাগল না। বেশি আঁটো। হবেই। সবাই তো আর বিশালদেহী হারকিউলিস নয়।

ক্যাশিয়ারের পকেট থেকে চাবি বের করে স্ট্রংরুম খোলা হলো। এক বান্ডিল হুন্ডি, তিনটে প্যাকেট আর ব্রীফকেসটা বের করে নিয়ে এল দু'জন লোক। ঠিক এই

সময় সদর দরজার বাইরে গাড়ি থামার শব্দ হলো।

আধ মিনিট পরেই অর্ধেক নামানো শাটারের গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা মারল কেউ।

'ডাস্টকোট খোলো, জলদি।' চাপা গলায় হুকুম দিল হারকিউলিস, 'যে-ই ভেতরে ঢুকবে, শুইয়ে দেবে।'

হুন্ডি আর টাকাগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল হারকিউলিস। অজ্ঞান তিন ক্লার্ককে দ্রুত কাউন্টারের তলায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল তিনজন; চতুর্থজন ওঁৎ পেতে রইল দরজার পাশে, কেউ ঢুকলেই তার ব্যবস্থা করতে পারবে।

সদর দরজার বাইরে একেবারে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে ব্যাংকের ডেলিভারী ভ্যানটা। অন্ধকার হয়ে এসেছে ইতোমধ্যেই। গাড়ির ভেতরে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। নিজের জায়গায় বসে আছে কোচোয়ান। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলছে গার্ড। একটু আগে শাটারে হাতের ধাক্কা মেরে জানান দিয়ে গেছে সে-ই।

রাস্তায় যানবাহনের ভিড়। পথচারীরও অভাব নেই।

কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে গার্ডের পাশে দাঁড়াল হারকিউলিস। কাঁধে হাত রাখতেই চমকে উঠে ফিরে চাইল গার্ড। আবছা অন্ধকারে ক্যাশিয়ারের পোশাক পরা লোকটার দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'স্টোর কই?'

'স্টোর?' বলেই অনুমান করল হারকিউলিস, ক্যাশিয়ারের কথাই জানতে চাইছে গার্ড। তাড়াতাড়ি বলল, 'ছুটিতে।'

গাড়ির ভেতর উঁকি মেরে দেখল আর কেউ নেই। বলল, 'তা ভেতরে গিয়ে টাকা পয়সাগুলো একটু নিয়ে আসবে?'

'কিন্তু...' মাথা চুলকাল গার্ড, 'গাড়ি ছেড়ে তো যাবার হুকুম নেই আমার।'

'ক'মিনিট আর লাগবে, যাও না। তোমার জায়গায় দাঁড়াচ্ছি আমি। এই ব্রীফকেস আর প্যাকেটগুলো গুছিয়ে রাখছি, ততক্ষণে তুমি টাকার অন্য প্যাকেটগুলো নিয়ে এসো।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্যাংকের সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল গার্ড। যাবে কি যাবে না আর একবার ভেবে ভেতরে ঢুকেই পড়ল শেষ পর্যন্ত।

'দরজাটা খোলো তো।' কোচোয়ানকে আদেশ দিল হারকিউলিস।

'এই যে, খুলছি।'

কোচোয়ানের সীটের পেছনে ভ্যানে ঢোকার পথ। ধাতুর শীট দিয়ে তৈরি কপাট। যতটা সম্ভব ডাকাতির সম্ভাবনা কমিয়ে আনা হয়েছে। কোচোয়ানের আসন কাত করে অর্ধেকটা তুলে কপাট খুলতে হয়, তারপর ভেতরে ঢোকা যাবে। কঠিন পথ। হবেই, টাকা ডেলিভারী ভ্যান তো।

সামান্য কয়েকটা প্যাকেটের জন্যে সেদিন কিন্তু অত কষ্ট করতে গেল না কোচোয়ান। সীটে বসেই কাত হয়ে ধাতুর কপাট একটু ফাঁক করে হারকিউলিসের হাত থেকে ব্রীফকেসটা নিল। হেঁট হয়ে কপাটের ফাঁক দিয়ে মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। টাকা কম হলে মাঝেমধ্যেই এভাবে রাখে কোচোয়ান, তারপর গার্ডকে পাশে বসিয়ে নিয়ে চলে যায়।

কোচোয়ানের অর্ধেকটা শরীর ভেতরে অদৃশ্য হতেই উঠে এল হারকিউলিস। যেন গাড়ির ভেতরটা দেখার জন্যেই উঁকিঝুঁকি মারছে, এমনি ভাব। তারপর অন্ধকারে হঠাৎ ওর হাত দুটো ভেতরে ঢুকে গেল।

রাস্তার কেউ দেখতেও পেল না, হঠাৎই শক্ত হয়ে গেল কোচোয়ানের পা দুটো, তারপরই নেতিয়ে পড়ল। নেতিয়ে পড়ল কোমরসুদ্ধ ওপরের দেহাংশও— সীটের নিচে।

কোচোয়ানের কোমরের বেল্ট খিঁচে ধরল হারকিউলিস। শিথিল দেহটা ঠেলে ঢুকিয়ে দিল গাড়ির ভেতর। লাশের পাশে পড়ে আছে টাকার প্যাকেট আর ব্রীফকেস। এছাড়াও রয়েছে আরও অনেকগুলো প্যাকেট, আর ছোট ছোট কাপড়ের ব্যাগ। অন্যান্য ব্রাঞ্চ থেকে তুলে এনেছে। হেড অফিসে যাবে।

রাস্তায় অত ভিড়। কিন্তু কেউই খেয়াল করল না, গত কয়েকটা মিনিটে রাস্তার ওপর কি ভয়ানক ব্যাপার ঘটে গেল।

গাড়ির ভেতরের মিটমিটে আলোয় হারকিউলিস দেখল মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কোচোয়ানের লাশটা। বয়ে যাওয়া রক্তের ধারাকে সেই মৃদু আলোয় কালচে দেখাচ্ছে। ঠিক কণ্ঠার কাছেই বিঁধিয়ে দেয়া ছুরিটার দিকে তাকাতে একটা নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল হারকিউলিসের ঠোঁটে।

রক্তের পরিমাণ দেখে একটু চিন্তিত হয়ে উঠল হারকিউলিস। কি করা যায়? গাড়ির কাঠের মেঝের ফাঁক দিয়ে বাইরে তো পড়বেই। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় কোন পথচারীর চোখে পড়ে গেলেই বিপদ।

কোচোয়ানের সীটটা তুলে দিয়ে কবাট খুলল হারকিউলিস। ভেতরে ঢুকে পড়ল। দ্রুত কোট খুলে নিল লাশের গা থেকে। একটানে কণ্ঠা থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে ক্ষতস্থানে শক্ত করে পেঁচাল কোটটা। এখন রক্ত বেরোলেও কোটের গরম কাপড়ে তা শুষে যাবে।

হাতে রক্ত লাগল হারকিউলিসের। কোচোয়ানের কোটেই মুছে নিল। একটু ভেবে ছুরিটাও মুছে নিয়ে বন্ধ করে রেখে দিল পকেটে। তারপর বেরিয়ে এল বাইরে। চারদিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই নেমে পড়ল। এগিয়ে গিয়ে ব্যাংকের শাটারে বিশেষ কায়দায় টোকা দিতেই খুলে গেল কাঁচের সুইংডোর।

'কই?' ভেতরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করল হারকিউলিস।

'আছে, কেরানী সাহেবদের সঙ্গেই,' জবাব দিল একজন।

'ঠিক আছে, ওটার কাপড় চোপড়ও খুলে নাও।'

গা থেকে ক্যাশিয়ারের পোশাক খুলে গার্ডের পোশাক পরে নিল হারকিউলিস। দু'জন ডাকাতকে ব্যাংকের ভেতরেই রেখে বাকি দু'জনকে নিয়ে বাইরে বের হয়ে এল।

আবার গাড়িতে উঠল হারকিউলিস। দু'জন ডাকাত বাইরে রাস্তায়ই দাঁড়িয়ে রইল। একে একে সব ক'টা প্যাকেট, থলি, ব্রীফকেস বাইরে বের করে দিল হারকিউলিস। ওগুলো নিয়ে আবার ব্যাংকের ভেতরে চলে গেল দুই ডাকাত। অনেকেই দেখল ঘটনাটা, কিন্তু কেউ মাথা ঘামাল না। বুঝল, গাড়ি থেকে টাকা পয়সা চালান যাচ্ছে ব্যাংকের ভেতরে। আগামী দিন হয়তো মক্কেলের ভিড় বাড়বে,

টাকা তুলতে আসবে; তাই আগে থেকে বন্দোবস্ত করে রাখা হচ্ছে।

ব্যাংকের ভেতরে টাকা পয়সা, সোনা রূপা ইত্যাদি সব নেয়া হয়ে গেলে সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করা হলো ওগুলো। কোটের পকেটে, হাতে যে যেখানে পারল তুলে নিল সব।

'চলো যাই,' বলল হারকিউলিস। 'কি করতে হবে আগেই তো বলেছি। টাকা পয়সাগুলো আমাদের গাড়িতে তুলে রেখে আবার ফিরে আসব। যাব আসব পেছনের দরজা দিয়েই। এরপর আমি চলে যাব ডেলিভারী ভ্যানে, তোমরা সবক'টা শাটার নামাবে, তালা দেবে, ড্রেনে ফেলে দেবে চাবিগুলো। আর হ্যাঁ, ম্যানেজারকে কি করতে হবে মনে থাকে যেন। কোন প্রশ্ন?'

'না,' একসঙ্গেই জবাব দিল চারজন ডাকাত।

'ঠিক আছে, যাই চলো। আরে হ্যাঁ, ব্রাঞ্চ অফিসের ঠিকানাটা তো নিলাম না।'

এগিয়ে গিয়ে কাঁচের সুইংডোরের কাছে দাঁড়াল হারকিউলিস। দরজার পাশেই হলদে কাগজে লিখে সাঁটানো আছে সবকটা ব্রাঞ্চের নাম আর ঠিকানা। 'এস' ব্রাঞ্চের ঠিকানাটা মুখস্থ করে নিল সে।

'ডাস্টকোটগুলো সব ফেলে যাবে ব্যাংকের ভেতরেই,' বলল হারকিউলিস। 'প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে পড়ার মত জায়গায়।'

একে একে সমস্ত মালপত্র নিজেদের গাড়িতে তুলল ডাকাতেরা। হারকিউলিসের পোশাকটাও বাদ গেল না। কাজ শেষ করে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে আবার সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল হারকিউলিস। গাড়িতে উঠল গিয়ে। বাইরের একটা শাটার নামাতেই ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারল সে।

গাড়ি নিয়ে সোজা গিয়ে 'এস' ব্রাঞ্চের সামনে দাঁড়াল হারকিউলিস। কোচবক্স থেকে নেমে গট গট করে হেঁটে গিয়ে ঢুকল ব্যাংকের ভেতরে। ক্যাশিয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে কোন প্রকার ভণিতা না করে বলল, 'দেন কি দেবেন। দেরি হয়ে যাবে নইলে।'

চমকে চোখ তুলে চাইল ক্যাশিয়ার, 'আপনাকে তো চিনি না। বড়রুক কোথায়?'

'আমিই এসেছি।'

বিড় বিড় করতে লাগল ক্যাশিয়ার, 'মাথা খারাপ হলো নাকি ম্যানেজারের? চিনি না, জানি না, এমন সব লোককে পাঠায় টাকা নিতে। কতবড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ···।'

'দেখুন, কথা বেশি বলছেন আপনি। আপনাকে জিজ্ঞেস করে লোক রাখবে নাকি বড় সাহেবরা?' চটে উঠল হারকিউলিস, 'বি-ব্রাঞ্চ থেকে রওনা দিয়েছি, হঠাৎ সেন্ট্রাল থেকে ফোন পেল ম্যানেজার, ওখানে অনেক টাকা জমা পড়েছে। খুব বিশ্বস্ত কাউকে পাঠাতে হবে। সামনে আমাকেই পেল। ব্যস, আমার আর সব কাজের দফা-রফা। বলে কিনা, আমাকেই আসতে হবে। শালার চাকরিই ছেড়ে দেব।'

'কিন্তু আপনাকে যে এর আগে কোনদিন দেখিনি!' সন্দেহ ক্যাশিয়ারের গলায়।

'অত চেনাচেনির দরকার হলে চলি আমি। আগামীকাল বড় সাহেবরা হয়তো

চেনাবেন আপনাকে।'

'আইডেন্টিটি আছে?' সন্দেহ তবু যায় না ক্যাশিয়ারের।

মনে মনে ঘাবড়ে গেলেও মুখের ভাব ঠিকই রাখল হারকিউলিস। দুর্ধর্ষ ডাকাত সে। অত সহজে মচকানোর নয়।

'তা আছে,' পাশের টুলটায় বসে পড়ল হারকিউলিস। পকেটে হাত ঢোকাল। আসলে ভাবল, কি করা যায় এখন? ব্যাংকের গার্ডের আইডেন্টিটি দেখতে কেমন সেটাও জানা নেই তার। কিন্তু বিচলিত ভাবটা একটুও প্রকাশ করল না চেহারায়।

গার্ডের পোশাকের পকেটে যত কাগজপত্র পাওয়া গেল একে একে সব টেনে বের করল। পাওয়া গেল আইডেন্টিটি। কিন্তু সেটা বড়রুকের। আড়চোখে একবার ক্যাশিয়ারের দিকে তাকিয়ে দেখল সে। একমনে টাকা গুনছে লোকটা। চোখের পলকে বড়রুকের আইডেন্টিটি ছিঁড়ে দুই টুকরো করে ফেলল হারকিউলিস। ছবি-সাঁটা অংশটা ঢুকিয়ে রাখল আবার পকেটে। বাকি অংশটা নিয়ে উঠে গিয়ে দাঁড়াল ক্যাশিয়ারের সামনে।

'এই নিন, আইডেন্টিটি।'

অর্ধেকটা টুকরো হাতে নিয়ে বোকার মত হারকিউলিসের দিকে তাকাল ক্যাশিয়ার, 'আর আধখানা কোথায়? ছবিটাই তো নেই।'

'অ্যাঁ, আধখানা দিয়েছি নাকি! কই, দেখি? আরে হ্যাঁ, তাই তো! বাকি অর্ধেকটা ছিঁড়েই গেল বোধহয়!' ক্যাশিয়ারের সামনেই পকেটে হাত ঢুকিয়ে আবার সমস্ত কাগজপত্রগুলো বের করল হারকিউলিস, অবশ্যই কার্ডের অন্য অর্ধেকটা ছাড়া। আঁতিপাতি করে খুঁজল।

'গেছে।' ক্যাশিয়ারের চোখে চোখে তাকাল হারকিউলিস, 'গেছে, বুঝলেন? কপাল যেদিন খারাপ হয়, সব দিক দিয়েই হয়। পনেরো-বিশটা ব্রাঞ্চে ঘুরতে হয় রোজ। সবাই আইডেন্টিটি দেখতে চায়। দেখাতে দেখাতে আর ঠিক থাকে নাকি ওটা। কোথায় কোন্ কাগজপত্রের সাথে ছিঁড়ে রয়ে গেছে, কে জানে! নাহ্, আজ আর টাকা নেয়া হলোই না। হেড অফিসের সাথে বোঝাপড়া করে নেবেন। চলি।' ঘুরে দাঁড়াল হারকিউলিস।

এবারে ক্যাশিয়ারের মনে হলো এ লোক জেনুইন। নইলে অত বড় জোর করত না। পেছন থেকে ডাকল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, অত রাগছেন কেন? কই দেখি আবার আইডেন্টিটিটা?'

দিল হারকিউলিস, 'এই যে, নিন।'

'এই অর্ধেকটা অবশ্য জেনুইনই। কিন্তু এতে না আছে আপনার ছবি, না নাম। কিন্তু কি আর করা, বিপদে যখন পড়েই গেছেন···।'

'আমি বিপদে পড়িনি। আপনাদের ব্রাঞ্চের টাকা নেবার কাজটা জোর করে আমার ওপর গছানো হয়েছে। তার ওপর অত হম্বিতম্বি করছেন। দাঁড়ান না, কালই ব্রাঞ্চ-ম্যানেজারের নামে জেনারেল ম্যানেজারের কাছে নালিশ করছি আমি।'

হারকিউলিসের মুখের দিকে তাকাল ক্যাশিয়ার। কিন্তু অন্য দিকে তাকিয়ে আপনমনে গজ গজ করছে লম্বা লোকটা।

'নিন, নিয়ে যান টাকা,' হঠাৎই মনস্থির করে বলল ক্যাশিয়ার. 'এই যে, এই

রেজিস্টারে সই দিন।'

ক্যাশিয়ারের সামনে টেবিল থেকে কলমটা তুলে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করল হারকিউলিস, 'কোথায়?'

'অতদিন ধরে টাকা নিচ্ছেন তাও জানেন না?'

ক্যাশিয়ারের চোখের দিকে তাকাল হারকিউলিস। ভয় পেয়ে গেল ক্যাশিয়ার। ধরে মারবেই নাকি তাকে গোঁয়ারগোবিন্দ লোকটা? তাড়াতাড়ি রেজিস্টারের একটা জায়গা দেখিয়ে বলল সে, 'এই যে, এখানে।'

পুরোপুরিই মেজাজ যেন খিঁচড়ে গেছে এমনি ভাব দেখিয়ে রেজিস্টারে এলোমেলো কয়েকটা টান মেরে কলমটা ছুঁড়ে ফেলল হারকিউলিস টেবিলের ওপর। হ্যাঁচকা টানে ক্যাশিয়ারের হাত থেকে টাকার প্যাকেটটা নিয়েই চলতে শুরু করল। বোকার মত হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল ক্যাশিয়ার। মন বলতে লাগল, হাঁকডাক যতই করুক, হারকিউলিস মার্কা অচেনা লোকটাকে টাকা দেয়া উচিত হলো না তার মোটেই।

ডাকাতি হয়ে যাবার এক ঘণ্টা পরেই কিন্তু ভ্যানটা হাইড পার্কের কোণে পড়ে থাকা অবস্থায় দেখল পুলিস; ভেতরে কোচোয়ানের রক্তাক্ত লাশ। সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান শুরু হয়ে গেল।

ডিকে ব্রাঞ্চের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকল পুলিস, ক্লার্কদের মুখে শুনল ওভারকোট আর ডাস্টকোট পরা পাঁচজন লোক এসেছিল ব্যাংকে। সর্দার মত লোকটা ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে ঢুকেছিল। তারপর ক্যাশিয়ারের ডাক পড়ে, কিন্তু ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে ম্যানেজারকে দেখতে পায়নি ক্যাশিয়ার।

গেল কোথায় ম্যানেজার? যোগসাজস আছে তার ডাকাতদের সঙ্গে?

আশেপাশে অনেক অফিস ছিল; সেগুলোর দারোয়ান কেয়ারটেকারদেরকে জেরা করে বিশেষ কোন সুবিধে হলো না। নতুন কিছু বলতে পারল না কেউ। ক্লার্করা আগেই তার চেয়ে অনেক বেশি বলেছে।

পুলিস ধরেই নিল, ডাকাতদের সঙ্গে যোগসাজস ছিল ম্যানেজারের। নাহলে এমনভাবে ডাকাতি করা সম্ভব নয়। আর যদি ডাকাতদের সঙ্গে সম্পর্ক নাই থাকবে তাহলে উধাও হয়ে গেল কেন সে?

পুলিস যথারীতি হুলিয়া বের করল ম্যানেজারের নামে। দেশের বন্দরে বন্দরে, ট্রেন-স্টেশনে ম্যানেজারের ছবি সমেত নির্দেশ চলে গেল। এই চেহারার লোককে দেখলেই যেন পাকড়াও করা হয়। কিন্তু কোথায় ব্লেজন! তার কোন খবর নেই।

এতটুকু করেই যথাসাধ্য করা হয়েছে ভেবে খুশি থাকল পুলিস।

যেদিন ডাকাতি হয় সেদিনই রাত দুটোয় লন্ডন থেকে সাউথ হ্যাম্পটন স্টেশনে এসে থামল একটা ট্রেন। প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে নামল পাঁচজন লোক। কারও গাল নিখুঁত কামানো, কারও ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, কারও নাকের নিচে ইয়া গোঁফ, কারও বা দাড়িগোঁফ কিচ্ছু নেই। কুলি ডেকে কামরা থেকে নামাল বেশ কিছু চটের বস্তা আর বিশাল একটা ট্রাংক। একটা গাড়ি ডেকে মালপত্রসহ স্টীমার ঘাটে চলল পাঁচজন।

স্টীমারে তোলা হলো মাল। প্রচুর বখসিস পেয়ে দাঁত বের করে হাসল কুলি।

সাহেবরা রীতিমত ভদ্রলোক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

স্টীমার যাবে দাহোমের কোটানৌতে।

ভোরে জোয়ার আসতেই ছাড়ল স্টীমার।

ডাকাতির খবরটা ভালমত ছড়ানোর আগেই ইংল্যান্ড থেকে অনেক দূরে চলে গেল স্টীমার।

ডাকাত আর ধরতে পারল না পুলিস। ব্লেজনকেও খুঁজে পেল না।

আস্তে আস্তে এই ডাকাতি নিয়ে জল্পনা-কল্পনা কমে এল। লোকে ভুলেও গেল এক সময়।

দুই

ফেঞ্চগিনির রাজধানী মানে কোনাক্রি অঞ্চলের নিতান্তই একটা ছোট গ্রাম। অথচ এখানেই বাস করেন এদেশের গভর্নর জেনারেল।

২৭ নভেম্বর। মহাহট্টগোল সমস্ত গ্রাম জুড়ে। উৎসব হবে। কিসের? সোজা ব্যাপার নয়, কয়েকজন অতি মান্যগণ্য লোক আসবেন গ্রামে। পর্যটক। গভর্নর আদেশ দিয়েছেন, বয়স্ক সকল পুরুষকে জাহাজ ঘাটায় গিয়ে অভ্যর্থনা করে আনতে হবে অতিথিদের। ইচ্ছে করলে বাচ্চা ছেলেমেয়ে কিংবা মহিলারাও যেতে পারে, কিন্তু তাদের জন্যে বাধ্যবাধকতা নেই।

অতিথিরা সংখ্যায় সাতজন। নাইজারের তীর ধরে ধরে এগিয়ে একটা বিশেষ অভিযান চালাবেন তাঁরা। একটা বিশেষ বাঁক পর্যন্ত গিয়ে তবে শেষ হবে এই অভিযান। এঁদেরকে পাঠিয়েছে ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় প্রশাসন দপ্তর। সেই দপ্তরেরই নির্দেশে গঠিত এক্সট্রা পার্লামেন্টারী কমিশনের উচ্চপদস্থ অফিসার এঁরা। কাউন্সিল মিনিস্টার স্ব-ইচ্ছায় এঁদের পাঠিয়েছেন বললে ভুল বলা হবে। আসলে নিজেদের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্যে ধরতে গেলে নিজেরাই অভিযানে বেরিয়েছেন তাঁরা। তবু সরকারী একটা ছাপ না থাকলে নয়, তাই নির্দেশনামা সই করিয়ে নেয়া হয়েছে প্রশাসন দপ্তর থেকে।

বিরাট একটা ঝগড়া মিটে গেল হঠাৎ করেই। মিটমাট হওয়ার মূলে এই নাইজার বাঁক অভিযান। রাজনৈতিক দু'টি দলের অতি ক্ষমতাবান দুই নেতার মধ্যে ঝগড়া বেধেছিল। ধারণা করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে সমঝোতা কোনদিনই হবে না, কিন্তু হয়ে গেল। দারুণ মজার না ব্যাপারটা?

দুই নেতার একজনের নাম বারজাক, অন্যজনের বুদ্রিয়ার্স।

প্রথমজন মোটাসোটা, গোলগাল চেহারা, কালো চাপদাড়ি। বড় বড় বুলি আওড়াতে ভালবাসেন। কিন্তু তাই বলে সবই যে ফাঁকা, তা নয়। বক্তৃতা দিতে পারেন জমিয়ে। দিলখোলা, হাসিখুশি এই মানুষটাকে অনেকেই ভালবাসে।

দ্বিতীয়জন কিন্তু এর ঠিক উল্টো। রোগাটে, দীর্ঘকায়। দাড়ি নেই। পাতলা ঠোঁটের ওপর দু'দিকে ইয়া লম্বা কোণ বের করা ঝোলা গোঁফ। উদ্ধত প্রকৃতির, সব

কিছুতেই জোর খাটাতে চান। এক নম্বরের নৈরাশ্যবাদী।

উদার প্রকৃতির মানুষ বারজাক। নিজেকে মেলে ধরাই তাঁর ইচ্ছে।

অত্যন্ত গুটোন স্বভাব বদ্রিয়ার্সের। ভাল করে কথাই বলতে চান না কারও সঙ্গে।

উপনিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাপারে চিরদিনই মতের অমিল দু'জনের—স্বভাব আর চেহারার মতই। শুধু উপনিবেশই নয়, যে কোন ব্যাপারে দু'জন একসঙ্গে হলেই বাদানুবাদ বাধবে। একজন কিছু একটা বললেই অন্যজন সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করে বসেন। আস্তে আস্তে তুমুল ঝগড়া বেধে যায় দু'জনের। ব্যাপারটার তখন নিষ্পত্তি করে উপস্থিত লোকেরা; অবশ্যই দু'দলে ভোট গ্রহণের মাধ্যমে।

বারজাক হয়তো বলবেন, 'শুয়োরের মাংসে বেশি চর্বি থাকা ভাল, খেতে স্বাদ।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করবেন বদ্রিয়ার্স, 'বেশি চর্বি খাওয়া খুব খারাপ, পেটে অসুখ হয়।'

'তাতে কি?' বারজাক বলবেন, 'খেয়ে তো শান্তি। হলোই বা পেটে অসুখ।'

'পেটে অসুখ থাকলে কারও শান্তি লাগে না,' গম্ভীর হয়ে প্রতিবাদ করবেন বদ্রিয়ার্স।

'বোকারাই পেট নিয়ে চিন্তা করে।'

'চিন্তা নেই যার, সে পাগল।'

ব্যস। এমনি করেই উত্তরোত্তর তর্ক বেড়ে যাবে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবেন দু'জনেই। তুমুল পর্যায়ে ঝগড়া না পৌঁছুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে দু'দলেরই সমর্থকেরা। তারপর নিষ্পত্তি করতে এগিয়ে আসবে।

আপাতত বিবাদের শুরু হয়েছে বারজাক প্রস্তাবিত একটা আইন প্রণয়ন নিয়ে। তিনি প্রস্তাব করেছেন, সেনেগাল, গামবিয়া, গিনির উপরের অংশ এবং নাইজারের পশ্চিমে অবস্থিত ফরাসী সুদানের কিছু অংশে ভোট ব্যবস্থা চালু করে কালোদেরও ভোটদানের সুযোগ দেয়া হোক। তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে প্রতিবাদ করে বসলেন বদ্রিয়ার্স। ব্যস, শুরু হয়ে গেল একজন আরেকজনকে লক্ষ্য করে চোখাচোখা যুক্তির বাণবর্ষণ।

একজনের যুক্তি, নিগ্রোরা যথেষ্ট সভ্য হয়ে গেছে। তাদের আর গোলাম বানিয়ে রেখে মানবতার অবমাননা করার কোন মানে হয় না। হল জুড়ে তুমুল করতালি উঠল। বারজাকের যুক্তিকে বাহবা দিল সবাই।

সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে উঠলেন বদ্রিয়ার্স। তাঁর মতে, নিগ্রোরা আগের মতই হিংস্র, বর্বর রয়ে গেছে। তাদের ভোটাধিকার দেয়া আর রুগ্ন শিশুর সঙ্গে ওষুধ নিয়ে পরামর্শ করা এক কথা। বরং আরও বেশি করে নিগ্রো অধ্যুষিত এলাকায় সৈন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করা উচিত। নিগ্রোদের ভোটাধিকার দেয়ার মত বোকামি কিছুতেই সরকারের করা উচিত হবে না। ফরাসীদের অধিকৃত দেশে ফরাসীরাই থাকবে একচেটিয়া অধিপতি, এতে অন্য কারও হস্তক্ষেপ হলে আর মান থাকল কোথায়? আবার হাততালিতে ফেটে পড়ল জনতা। দেশের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে আনন্দ আর বাঁধ মানছে না ওদের।

এদিকে কিন্তু মুখ কালো করে বসে আছেন উপনিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়। মহাফাঁপরে পড়েছেন তিনি। দু'পক্ষের কথাতেই যুক্তি আছে। ফরাসীদের শাসনে সত্যিই অভ্যস্ত হয়ে এসেছে ফরাসী-অধিকৃত নিগ্রোরা। লেখাপড়াও শিখছে কেউ কেউ। কিন্তু এরপরও গোলমালের খবর যে আসছে না, তা নয়। গ্রামে গ্রামে লুটতরাজ আর হাঙ্গামা চলছে। গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে নিরীহ বাসিন্দারা। গুজব শোনা যাচ্ছে, কোথায় নাকি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে একটা নির্দলীয় শক্তি, ঘাঁটি গেড়ে বসেছে আফ্রিকার অজ্ঞাত এক অঞ্চলে। উঠে দাঁড়িয়ে মন্ত্রী মহোদয় একেবারে নিরপেক্ষ থেকে কথাগুলো জানালেন শ্রোতাদের। আবার হাততালি পড়ল। এতবড় বিজ্ঞ মন্ত্রীর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল জনতা।

হাততালি আর হট্টগোল শেষ হলে এবারে কথা বলল শ্রোতাদের একজন, 'দু'জনের কেউই যখন ব্যাপারটায় একমত হতে পারছেন না, তখন গিয়ে দেখে আসলেই তো হয়, কোনটা করা দরকার আর কোনটা নয়।'

'এতবার যাওয়া হয়েছে ওসব অঞ্চলে যে আর নতুন কিছুই দেখার নেই,' বললেন মন্ত্রী। 'তবে চেম্বার সিদ্ধান্ত নিলে আরেকবার যাওয়া যেতে পারে।'

অনেক তর্কবিতর্কের পর ঠিক হলো, আরেকবার যাওয়াই উচিত।

'তাহলে অভিযানের নেতা কে হবেন সদস্যরাই ঠিক করে দিক,' নিজের গা বাঁচিয়ে বললেন মন্ত্রী।

আবার শুরু হলো তর্ক, হট্টগোল, ঝগড়া। অনেক কষ্টে চেঁচামেচি থামিয়ে ভোট নেবার আদেশ দিলেন মন্ত্রী। রাজি হলো সবাই। ভোটও নেয়া হলো। কিন্তু সমস্যা তাতে বাড়ল বই কমল না। দেখা গেল যে, সমান সমান ভোট পেয়েছেন দুই নেতা।

'মহা মুসিবত!' বলে দু'হাতে কপাল চেপে ধরে বসে রইলেন মন্ত্রী। এরপর কি করা যায়?

তখন মীমাংসা করে দিল একজন অতিরসিক শ্রোতা, 'এক কাজ করলেই হয়। দু'জনকে নেতা করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।'

সবারই পছন্দ হয়ে গেল প্রস্তাবটা। কারণও ছিল। আসলে সবাই চাইছিল কোনমতে দুই নেতাকে কয়েকমাসের জন্যে দেশছাড়া করতে। অন্তত সে কয়েকটা মাস উপনিবেশ সংক্রান্ত বেহুদা চেঁচামেচি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

অতএব বারজাক এবং বদ্রিয়ার্স দু'জনেই আফ্রিকা অভিযানে নেতা নির্বাচিত হয়ে গেলেন। কিন্তু একটু চালাকি করলেন প্রবীণ মন্ত্রী। দু'জনের মধ্যে চূড়ান্ত ক্ষমতা কার থাকবে সেটা বলে দিলেন তিনি। থাকবে বারজাকের। কারণ তিনি বদ্রিয়ার্সের চেয়ে তিনদিনের বড়। মনে মনে ভয়ানক চটে গেলেন বদ্রিয়ার্স, কিন্তু মন্ত্রীর বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস হলো না তাঁর।

প্রবল দুই প্রতিযোগীর অদ্ভুত অভিযানে আরও কয়েকজন যাবেন, সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। এঁদের মধ্যে একজনের নাম ড. চাতোন্নে, নামী ডাক্তার। সব সময় হাসিখুশি থাকতে ভালবাসেন। মোটামুটি লম্বা বলা চলে তাঁকে, পাঁচ ফুট আট। বয়স পঞ্চান্ন পেরোয়নি, অথচ মাথার একটা চুলও কালো নেই। সজারুর কাঁটার মত গোঁফজোড়াও পেকে ধবধবে সাদা। সত্যিকারের বুদ্ধিমান বলতে বোধহয় এঁদের

মত লোককেই বোঝায়।

দ্বিতীয়জন ভৌগোলিক সমিতির সদস্য মসিয়ে ইসিদোর তাসিন। অনেক বড় বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রায় সারাক্ষণই ধ্যানমগ্ন থাকেন। কাজেই বাহ্যিক রসকষ তেমন নেই, বেশি কথা বলেন না।

আর যাচ্ছেন মন্ত্রী পরিষদের তিনজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। এঁরা হলেন মসিয়ে পসি, মসিয়ে কুইরো এবং মসিয়ে হেইরো।

শেষ লোকটি কিন্তু তেমন গণ্যমান্য বা নাম করা কেউ নয়। লা এক্সপ্যানসন ফ্রাঁসে নামে এক দৈনিক খবরের কাগজের রিপোর্টার। নিজের কাজকে খুব শ্রদ্ধা করে। কর্তব্যে ফাঁকি নেই, সৎ, বুদ্ধিমান। অনেকেই বলে, রিপোর্টারের কাজ না করে স্টেজে নায়কের অভিনয় করলেই তাকে মানাত ভাল। নাম, আমিদী ফ্লোরেন্স।

এই আটজন বিশেষ অতিথিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নেবার জন্যেই নিজ দপ্তরের লোক-লস্কর আর কোনাক্রি অঞ্চলের সমস্ত শক্তসমর্থ গ্রামবাসীকে নিয়ে জাহাজঘাটায় হাজির হয়েছেন ফ্রেঞ্চগিনির গভর্নর জেনারেল। অভ্যর্থনার বহর দেখে মনে হলো, সাগর পেরিয়ে মানুষ নয়, আকাশ থেকেই ফেরেশতারা এসে হাজির হয়েছেন।

অভ্যর্থনার জাঁকজমক দেখে প্রথমে ভড়কে গেলেও ধাতস্থ হয়ে গভর্নরকে ধন্যবাদ জানালেন বারজাক। তারপর জাহাজঘাটায় জাহাজ থেকে নামিয়ে আনা একটা টেবিলে দাঁড়িয়ে এক গালভরা বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা শুরু হতেই ফিসফিস করে নিজের লোকদের বলে দিলেন গভর্নর হাততালির কমতি যেন না হয়। সুতরাং, বক্তৃতা শেষ হবার পর অন্তত আধঘণ্টা লাগল হাততালি শেষ হতে। গ্রামবাসীদের বলে বলে হাততালি দেয়াল দপ্তরের লোকেরা।

বারজাকের বক্তৃতা শেষ হলে উঠে দাঁড়ালেন বদ্রিয়ার্স। তাঁর তেজী বক্তৃতার অর্থ অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা কি বুঝল কে জানে, কিন্তু জোর হাততালিতে তারা আকাশ কাঁপিয়ে দিল। আসলে হাততালি দেয়াটাকে একটা মজা বলে ধরে নিল ওরা।

মহা সমারোহে অতিথিদের গভর্নরের বাড়িতে নিয়ে আসা হলো। এখানে তিনদিন থেকে অভিযাত্রীরা পরবর্তী কর্মসূচী ঠিক করবে।

যেতে হবে অনেক পথ। প্রস্তাবিত আইনের মাধ্যমে যে অঞ্চলকে ভোটাধিকার দিতে চাইছেন বারজাক, আয়তনে সেটা ফ্রান্সের তিনগুণ, প্রায় দশ লক্ষ বর্গমাইল। এত বড় এলাকার সমস্ত জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়।

ঠিক হলো, দু'দলে ভাগ হয়ে এগোবে অভিযাত্রীরা। কিন্তু দু'দলকে সমান পথ পেরোতে হবে না। একদল যাবে দেড়হাজার মাইল, অন্যদল ঘোরাপথে আড়াই হাজার মাইল।

প্রথমে এক দলে রওনা হবে অভিযাত্রীরা। কোনাক্রি হয়ে প্রথমে কানকান, সেখান থেকে কেনেডোগের সবচেয়ে বড় শহর সিকাসোতে যাবে। এখান থেকে দু'দলে ভাগ হবে ওরা।

বদ্রিয়ার্সের নেতৃত্বে একদল যাবে দক্ষিণে একেবারে আইভরি কোস্ট পর্যন্ত।

অন্য দলটা বারজাকের নেতৃত্বে পুবদিকে চলে সেঙ্গ-তে নাইজার নদীর পাড়ে পৌঁছুবে, তারপর নদীর তীর ধরে ধরে গিয়ে পৌঁছুবে দাহোমের উপকূলে। আগস্ট নাগাদ গ্র্যান্ড-ব্যাসামে পৌঁছুবেন বদ্রিয়ার্স, আর অক্টোবরে বারজাক গিয়ে থামবেন কোটানৌ।

এতটা পথ পেরোনো সহজ কথা নয়। তাও ভাল পথ হলে কথা ছিল। আফ্রিকা। দুর্গম জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত আর জলাভূমিতে ঠাসা। হিংস্র জানোয়ারের ভয় তো আছেই, আছে মারাত্মক বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ-সাপখোপ। এসব ডিঙিয়ে যাওয়া যে কত ভয়ঙ্কর, তা বলে বোঝানো যাবে না।

এত বিপদের সম্ভাবনা পথে, অথচ খুশি উপচে পড়ছে মসিয়ে ইসিদোর তাসিনের। ভূগোল বিশারদ তিনি। গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক তথ্য জোগাড়ের জন্যে এর চেয়ে ভাল অভিযান আর কি হতে পারে? এতদিন যাবৎ লোকের অজানা অনেক কিছুই জানবেন তিনি, শুনবেন, চোখেও দেখবেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এই সব অঞ্চলে অভিযান চালাতে মাত্র দুই যুগ* আগেও সাহস করত না লোকে। কিন্তু নাইজারের বাঁক পর্যন্ত ফরাসী শাসন কায়েম হওয়ায় ওখান পর্যন্ত সিপাই-সান্ত্রী আছে, তাই সহজেই বেড়িয়ে আসা যাবে অঞ্চলটা তাসিনের ধারণা।

ঠিক হলো, পয়লা ডিসেম্বর থেকে যাত্রা শুরু হবে।

এর আগের দিন, অর্থাৎ তিরিশে নভেম্বরে এক বিশেষ ভোজসভায় অতিথিদের আপ্যায়িত করবেন ফেঞ্চগিনির গভর্নর জেনারেল। অতি সম্মানের সঙ্গে ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হবে, সেই সঙ্গে এক অসভ্য জংলী এলাকায় হবে গণতন্ত্র স্থাপন অভিযানের সূচনা।

তিরিশে নভেম্বর। সারাটা সকাল রোদে রোদে ঘুরে, স্থানীয় লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, সন্ধে নাগাদ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে সবে গভর্নর ভবনে ফিরে এসেছেন বারজাক। গা থেকে কোটটা খুলতে যাচ্ছেন, এমন সময় আর্দালী এসে খবর দিল, দু'জন লোক দেখা করতে এসেছে।

'দু'জন?' প্রশ্ন করলেন বারজাক।

'একজন পুরুষ, একজন মহিলা। লোকটা ভারি অদ্ভুত।'

'কলোনির কেউ?'

'এর আগে কখনও দেখিনি, তবে হতে পারে। অস্বাভাবিক ঢ্যাঙা লোকটা একেবারে নুড়ি পাথর। ঘাসের চিহ্নও নেই কোথাও।'

'নুড়ি পাথর?' বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন বারজাক।

'বুঝলেন না, স্যার।' হাসল আর্দালী। বারজাকের মিশুক স্বভাবের পরিচয় আগেই পেয়ে গেছে সে। তাই তার মনে অহেতুক শংকা নেই, 'টাক, টাক। মাথায় টাক চকচক করছে লোকটার। চোখ দুটো যেন পিংপং বল।'

'আরে সর্বনাশ!' চোখ কপালে তুললেন বারজাক, 'দারুণ কল্পনা দেখছি হে তোমার। তা ভদ্রমহিলার মাথায় ঘাস আছে তো? আর চোখ?'

---

* জুল ভার্ন এই বই লেখার সময় থেকে।

'তা তো আছেই, স্যার। ভদ্রমহিলা নুড়ি পাথরের ঠিক উল্টো।'
'বয়েস কেমন? দেখতে?'
'মোটামুটি।'
'সুন্দরী?'
'তা বলতে পারেন। এবং ফিটফাট।'
অন্যমনস্কভাবে গোঁফে তা দিতে লাগলেন বারজাক।
'হু! ঠিক আছে, পাঠিয়ে দাও।'
আর্দালী চলে যেতেই ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন বারজাক। নিজের থলথলে চেহারাটা দেখলেন। ঘড়িতে ঢং ঢং করে সন্ধ্যা ছ'টা বাজার সংকেত হলো, কানেই ঢুকল না। আরেকটা জিনিস কল্পনাতেই আসেনি তাঁর, আসার কথাও নয়—যে ঠিক, এই সময়ে লন্ডনে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লুট হচ্ছিল।
আর্দালীর পিছু পিছু ঘরে এসে ঢুকল একজন বছর চল্লিশ বয়সের লোক, সঙ্গে বছর পঁচিশেকের একটি মেয়ে। দু'জনকে পৌঁছে দিয়েই বেরিয়ে গেল আর্দালী।
ঠিকই বলেছে আর্দালী, লোকটা সত্যিই ঢ্যাঙা। আঁটসাঁট পোশাকে ঢাকা ধড়টার তুলনায় পা দুটো যেন একটু বেশিই লম্বা। চোখ দুটো পিংপং বলের মত না হলেও ঠেলে বেরিয়ে আসছে। সরু গলাটা অস্বাভাবিক লম্বা। এর ওপর আলতো করে বসিয়ে রাখা হয়েছে মাথাটা, যেন বেশি নাড়াচাড়া করলেই খসে পড়বে। ছুরির মত ধারাল বিশাল লম্বা নাক, পুরু ঠোঁট। লোকটার দেখার মত একমাত্র জিনিস হলো গোঁফজোড়া। সত্যিই সুন্দর।
চকচকে টাক। কিন্তু একটু ভুল কথা বলেছে আর্দালী। নুড়ি পাথরের অনেক নিচে ঘাড়ের কাছে কয়েক গুচ্ছ ঘাস আছে। আর আছে দুই গালে লম্বা জুলফি। অতি শুকনো পাটের মত রঙ। এত যে কুৎসিত কিন্তু তবু ভাল লাগে লোকটাকে। সারাক্ষণই মুখে হাসি লেগে আছে, চোখ দুটোয় অকপট সরলতা।
আর মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী। সুগঠিতা, ছিপছিপে। নিখুঁত নাক। বিশাল চোখ দুটোকে ঢেকে রেখেছে বড় বড় মোটা ঘন পাপড়ি। অত সুন্দর চোখ জীবনে দেখেননি বারজাক। মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুল।
দু'জনকেই বসতে বললেন বারজাক।
'মসিয়ে বারজাক, গায়ে পড়েই আলাপ করতে এলাম আপনার সাথে,' কথা শুরু করল নুড়ি পাথর। 'আসলে একটা সাহায্য চাইতে এসেছি। আমি জানি, দেখতে আমি সুবিধের নই। নামটাও অদ্ভুত—এজনর দ্য সেন্ট বেরেন। ব্যাচেলর। অঢেল সম্পত্তি রেখে গেছেন বাবা রেনেজ শহরে।' কথা বলার সময় প্রচুর হাত পা নাড়েন বেরেন।
'আর এই যে, ইনি,' মেয়েটার পরিচয় দিলেন বেরেন, 'আমার খালা, মিস্ জেন ব্লেজন।'
'আপনার খালা?' অবাক হলেন বারজাক।
'হ্যাঁ হ্যাঁ! আমার খালা। দুনিয়ার আর দশটা খালার মতই খালা।' জোর দিয়ে বললেন এজনর।
ঠোঁট দটো অতি সামান্য ফাঁক করল মেয়েটা। বারজাকের মনে হলো, এত

সুন্দর হাসি আর দেখেননি।

ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে প্রতিবাদ করল জেন, 'খালি সুযোগ পেলেই হলো, আমাকে ওঁর খালা প্রতিপন্ন করতে উঠে পড়ে লেগে যান মসিয়ে দ্য সেন্ট বেরেন।'

'তাতে নিজের বয়েস কমে যায়,' বললেন বেরেন।

'আসলে লোককে চমকে দিতে চান উনি। তারপরেই আবার জন্মগত সম্পর্ক যা, আমার মামা হয়ে যান।'

'তাহলে এবার কাজের কথায় আসা যাক,' বললেন বেরেন। 'দু'জনেরই জ্ঞানপিপাসা আমাদের প্রবল। ভ্রমণের নেশাও খুবই। নতুন দেশ আর আবিষ্কারের সন্ধানে বেরিয়েছি এ যাত্রায়। মেয়ে হলে কি হবে, আমার এই ভাগ্নীটির ভয়ডর বলতে কিচ্ছু নেই। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়ে, আর সব সময় সঙ্গে এই মামাটি থাকা চাই-ই,' নিজের বুকে টোকা দিল সে। 'এবারেও বেরিয়েছি। হঠাৎ শুনলাম আমরা এবার যে পথে যাব ঠিক করেছি, আপনারাও সেই পথেই যাবেন। তখন ভাবলাম, আপনাদের সঙ্গেই যাই। কারণ ভয়ঙ্কর বিপদ-সংকুল পথে দল ভারি হলে অনেক দিক দিয়েই সুবিধে। তাই আপনার কাছে এলাম। সঙ্গে যাবার অনুমতি পাব কি?'

'আমার আপত্তি নেই,' বললেন বারজাক। 'কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমার সহযোগীদের সঙ্গে একটু পরামর্শ না করে পাকা কথা দিতে পারছি না।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' বললেন বেরেন।

'ব্যাপারটা কি জানেন, সঙ্গে মেয়েমানুষ থাকলে এ ধরনের অভিযানে অনেক রকম বিপত্তি আসার সম্ভাবনা থাকে। হয়তো এজন্যেই আপত্তি তুলবে আমার লোকেরা।'

'দেখুন, মসিয়ে বারজাক, আমার ভাগ্নী বলে বাড়িয়ে বলছি না, অনেক পুরুষ মানুষের চাইতে ওর সাহস অনেক বেশি। আল্লাহ আসলে ছেলে করতে করতে মেয়ে বানিয়ে ফেলেছে ওকে।'

'শুধু সঙ্গে থাকা ছাড়া আর কোন ব্যাপারেই বিরক্ত করব না আপনাদের,' বলল জেন। 'সমস্ত ব্যবস্থা আমরা করেই রেখেছি। প্রয়োজনীয় সব রকমের জিনিসপত্র, ঘোড়া, কুলি প্রচুর নিয়েছি আমরা। খুব ভাল দোভাষীর কাজ চালাতে পারে এমন দু'জন গাইডও ভাড়া করেছি।'

'কিন্তু তবু সহযাত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে আমাকে,' আগের কথাই বললেন বারজাক। 'হাজার হোক, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-অভিযানে বেরিয়েছি, সামান্য ভুল করলেও চলবে না। তবে হ্যাঁ, অত করে যখন বলছেন, ওদের রাজি করাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি।'

'তাহলে কখন জানতে পারছি আমরা?'

'রওনা তো কালকেই দেব। তার আগেই জানতে পারবেন।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। তাহলে চলি এখন।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল মামা-ভাগ্নী।

রাতে ডিনারে বসে সহযাত্রীদের কাছে কথাটা তুললেন বারজাক। কেউই অমত করল না। সঙ্গে একজন রূপসী থাকুক, মনে প্রাণে সবারই এই কামনা।

আপত্তি করলেন না, কিন্তু মনে মনে খুঁত খুঁত করতেই লাগলেন বদ্রিয়ার্স। জেনের রূপের কথা নিয়ে যেন একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছেন বারজাক। কোন ফাঁদ নয়তো? এরকম একটা অভিযানের সঙ্গে একজন মেয়েমানুষ ইচ্ছে করে যেতে চায়, এটা খুবই অস্বাভাবিক। অন্য কোন মতলব নেই তো বারজাকের? মিনিস্ট্রি আর চেম্বার থেকে অনেক রকম গুজব আসছে কানে, সে সবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তো ওই মেয়ের?

সবাই রাজি হয়ে গেছে জেন আর তার মামাকে সঙ্গে নিতে, তাই ইচ্ছে করেই কোন আপত্তি করলেন না বদ্রিয়ার্স। দেখাই যাক না কি হয়। বিপদের মোকাবিলা না করতে পারার মত কাপুরুষ নন তিনি।

'দু'জন কে আমি জানি না,' কথা বললেন গভর্নর, 'তবে দিন পনেরো কোনাক্রিতে আছে, শুনেছি।'

'দু'জনের মধ্যে একজনের কথা তো শোনা যেতেই হবে,' বললেন বারজাক। 'চোখে পড়ার মত মেয়ে।'

'আমিও তাই শুনেছি। ডানাকাটা পরী নাকি, সেনেগাল থেকে স্টীমারে এসেছে। আপনি তো স্যার বলছেন,' বারজাককে লক্ষ করে বললেন গভর্নর, 'নিছক বেড়ানোর উদ্দেশ্যেই যদি যেতে চান ওঁরা, তো আমার মনে হয় কোন অসুবিধে হবে না।'

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, সেন্ট বেরেন আর জেন ব্লেজনকে সঙ্গে নেয়া হবে। কুলি আর গাইড বাদে লোক সংখ্যা দাঁড়াল এখন দশ।

কোথায় যোগাযোগ করতে হবে, ঠিকানা রেখেছিলেন বারজাক। পরদিন ভোরে উঠেই মামা-ভাগ্নীকে সুখবরটা দেবার জন্যে ছুটলেন তিনি। গিয়ে দেখলেন, জেনের সঙ্গে কথা বলছে সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন, পিয়েরি মারসিনে। অভিযাত্রীদের নিরাপত্তার জন্যে সেও নিজের দলবল নিয়ে সঙ্গে যাবে।

জেনকে ডেকে খবরটা দিলেন বারজাক। তাড়াতাড়ি তৈরি হতে বললেন মামা-ভাগ্নীকে। যাত্রার বেশি দেরি নেই আর।

জেনের সঙ্গে আগেরই পরিচয় রয়েছে ক্যাপ্টেনের, দেখে মনটা কিন্তু খারাপ হয়ে গেল বারজাকের।

তিন

দেহমন দুইই ভেঙে পড়েছে বৃদ্ধ লর্ড ব্লেজনের। গ্লেনর কাসলের অধিবাসী তিনি। কিন্তু এখানে আর থাকতে মন চাইছে না। মুখ দেখাতে পারছেন না লজ্জায়। আকাশচুম্বী সুনাম ধূলিসাৎ হয়ে গেছে তাঁর। চব্বিশ ঘণ্টাই দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে বসে থাকেন। কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই।

অথচ পূর্বপুরুষদের নাম-যশ, শৌর্য বীর্য অটুট রেখে এই লর্ড ব্লেজনই নৌবাহিনীর অতি উঁচু পদে আরোহণ করেছিলেন ষাট বছর আগে। দেশের জন্যে

অকাতরে রক্তদান করেছিলেন যাঁর পূর্বপুরুষরা, তাঁদের উপযুক্ত বংশধরই হতে পেরেছিলেন এডোয়ার্ড অ্যালান ব্লেজন। ইংল্যান্ডের দেশপ্রেমের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে ব্লেজন পরিবারের নাম। অথচ এহেন পরিবারের মুখেই চুনকালি দিল হতভাগারা, বলেন আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন তিনি।

বাইশ বছর বয়েসে বিয়ে করেছিলেন লর্ড ব্লেজন। বছর খানেক পরেই একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে তাঁর। এর বিশ বছর পরে হয় একটি ছেলে। আরও পাঁচ বছর পরে আরেকটি ছেলে। এবং প্রসবকালে মারা যান লেডী ব্লেজন।

শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েন ব্লেজন। শেষে আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে আর ঘর রক্ষার কারণে নৌবাহিনীরই এক সহকর্মীর বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করেন তিনি। কপর্দকশূন্য স্ত্রীটি কিন্তু একেবারে খালি হাতে আসেননি; সঙ্গে নিয়ে আসেন তাঁর ষোলো বছরের ছেলেকে। নাম উইলিয়াম।

কয়েক বছর পরেই দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে আর একটি মেয়ে হয় ব্লেজনের। নাম রাখেন জেন। এরপরেই আবার বিপত্নীক হন তিনি। বয়েস তখন ষাটের কাছাকাছি। এই বয়েসে আর বিয়ে করার কোন মানে হয় না। তাই ছেলেমেয়েদের মানুষ করার কাজে মন দেন তিনি।

অনেক আগেই বিয়ে হয়ে গেছে বড় মেয়ের। দুই ছেলে আর ছোট মেয়েকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলায় মন দিলেন ব্লেজন। সৎ ছেলে উইলিয়ামকেও একই নজরে দেখলেন। কিন্তু আঘাত দিল তাঁকে সৎ ছেলে।

কিছুতেই ব্লেজন পরিবারের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারল না উইলিয়াম। ওকে মানুষ করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন ব্লেজন। নিজের ঔরসজাত ছেলেমেয়ের সঙ্গে উইলিয়ামেরও যত্নের কোন তফাৎ রাখেননি, কিন্তু তবু হলো না। ভেতরে ভেতরে একটা চাপা বিদ্বেষ, বৈরীভাব পুষে রাখল সে মনে।

অসৎ সঙ্গ জোটাল উইলিয়াম। জুয়া খেলা শিখল। কিন্তু টাকা পায় কোথায়? রহস্যটা ফাঁস হলো একদিন। বিপুল অঙ্কের একটা ব্যাংক ড্রাফট এসে পৌছল ব্লেজনের কাছে। তাঁরই সই নিখুঁত ভাবে জাল করা রয়েছে ড্রাফটে।

সবই বুঝলেন ব্লেজন। একটি কথা না বলে ব্যাংকের পুরো পাওনা মিটিয়ে দিলেন। কিন্তু এবারে আর ক্ষমা করলেন না, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন উইলিয়ামকে। ব্লেজন পরিবারের উপর আক্রোশ আরও বেড়ে গেল উইলিয়ামের। বের করে দেবার সময় তাকে কিছু টাকা দিতে চাইলেন ব্লেজন। কিন্তু নিল না উইলিয়াম, সৎ বাপের মুখের ওপর টাকাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গট গট করে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। উধাও হয়ে গেল কোথায়।

দিন যায়। বাপের নাম রাখল বড় ছেলে জর্জ ব্লেজন। সেনাবাহিনীতে যোগ দিল। অনেক উপরে উঠে গেল নিজের দক্ষতায়। চারদিকে দ্রুত সুনাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে, ঠিক এই সময় একদিন খবর পাওয়া গেল, বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে জর্জ। দলবল নিয়ে ডাকাতি লুটতরাজে মন দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করতে সৈন্য পাঠানো হলো। মারা গেল জর্জ কামানের গোলায়। তাকে মারতে পাঠানো অফিসারেরও মৃত্যু হলো সেই সাথে।

যথাসময়ে খবর এসে পৌছল ইংল্যান্ডে। ছি ছি পড়ে গেল। গরম ভাষায়

সম্পাদকীয় লিখে চলল খবরের কাগজগুলো। কাটতি বেড়ে গেল রাতারাতি দুইগুণ, তিনগুণ। কান দুটো যেন খসে পড়ে গেল লর্ড ব্লেজনের। ঘরে বন্দী করে রাখলেন তিনি নিজেকে। ছেলের এই অপকীর্তির পর আর সমাজে মুখ দেখানো যায় না।

বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আফ্রিকায় পাড়ি জমাল ছোট মেয়ে জেন ব্লেজন। কেন, কোন্ অঞ্চলে যাচ্ছে সে, শুনলে নিশ্চয়ই চমকে উঠতেন ব্লেজন। কিছুতেই যেতে দিতেন না। তাই তাঁকে সত্যি কথা কিছুই বলল না জেন।

ব্লেজনের বড় মেয়ের ছেলে এজনর দ্য সেন্ট বেরেন। তাঁর ছোট খালা জেনের চাইতে পনেরো বছরের বড়। মাছ ধরার সাংঘাতিক নেশা। দারুণ অন্যমনস্ক আর নারীজাতির প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা। কিন্তু নানার মন জয় করতে পেরেছিলেন কুৎসিত দর্শন এই নাতিটা। নানা বিয়ের কথা বললেই প্রতিবাদ করেন, 'বিয়ে করে কি হবে শুনি? বৌয়ের কাঁদুনী আমি একদম সইতে পারব না। ওগুলোকে বিশ্বাস আছে নাকি?'

পরিবারের সবাই ভালবাসে এজনরকে। তাঁর মিষ্টি স্বভাবের জন্যে। আর জেনের সঙ্গে তো তাঁর ভীষণ ভাব। জেনকে ধরতে গেলে মানুষই করেছেন তিনি। তাকে হাত ধরে হাঁটতে শিখিয়েছেন। বড় হলে সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। এদিকে এজনরকে ছাড়া জেনেরও চলে না। যেহেতু বয়েসে বড় তাই সম্পর্কটা উল্টে তাঁকেই মামা বলে ডাকে।

তাই বলে সব সময় নয়। দাবড়ানি দেয়ার দরকার হলেই মামা পরিণত হয়ে যান বোনপোতে, আর ভাগ্নী খালায়। খেপে গেলে খালাকে রীতিমত ভয় পান এজনর।

এইতো সেদিন এজনরকে ডেকে বলল জেন, 'মামা, ভাইয়ার ব্যাপারটা কি বলো তো?'

'কে? জর্জের কথা বলছিস?'

'হ্যাঁ।'

'খবরদার জেন।' সাবধানে এদিক ওদিক চাইলেন এজনর, 'এ বাড়িতে ও নাম উচ্চারণ করিসনে। নানা শুনলে আস্ত রাখবেন না।'

'কেন শুনি? কি তার অপরাধ?'

'আমি বলতে পারব না সেকথা।'

বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন এজনর। খেপে গেল জেন। চেঁচিয়ে পেছন থেকে ডাকল, 'এজনর!'

'খালা?' ঘুরে দাঁড়ালেন এজনর।

'যাবে না বলছি! তাহলে তোমার সাথে আর কোন সম্পর্ক নেই আমার। জলদি বলো, কি জানো?'

খালাকে চটানো উচিত মনে করলেন না এজনর। ফিরে এসে জর্জের সমস্ত কাহিনী শোনালেন জেনকে।

নরম হয়ে এল জেন, বলল, 'মামা?'

'বলো।'

'সত্যিই অন্যায় করেছে ভাইয়া, কি করে নিশ্চিত হলে?'

'দেশসুদ্ধ লোক জানে···।'

'কি করে জানল?'

'কেন, তাকে বন্দী করে আনতে অফিসার পাঠানো হলো না? সেও মরল, জর্জও মরল।'

'কিন্তু এতে কি প্রমাণ হয়? আমি বলছি কি জানো, মামা, আসলে ভাইয়া ছিল একেবারে নির্দোষ। তার মত লোক অমন কাজ করতেই পারে না। সবই লোকের মিথ্যে রটনা। এমন কি বাবাও তার নিজের ছেলেকে চিনতে পারেননি।'

'কিন্তু···।' কোন উত্তর দিতে না পেরে আমতা আমতা করতে লাগলেন এজনর।

'কোন কিন্তু নেই, মামা, ভাইয়া নির্দোষ।'

'হয়তো নির্দোষ, কিন্তু প্রমাণ করবি কি করে?'

'গেলেই পাওয়া যাবে।'

'গেলে! কোথায়?'

'আর কোথায়? যেখানে কবর দেয়া হয়েছে ভাইয়াকে।'

'আফ্রিকায়!'

'হ্যাঁ, আফ্রিকায়। কবর খুঁজলেই পাওয়া যাবে সব প্রমাণ, আমি নিশ্চিত। তাছাড়া ভাইয়ার সঙ্গের দু'একজন লোক নিশ্চয়ই বেঁচে আছে, তারা সত্যি ঘটনা বলবে।'

'তা না হয় বলবে, কিন্তু যাবে কে?'

'তুমি যাবে।'

'আমি! হাজার মাইল পেরিয়ে আফ্রিকায়···।'

'হাজার মাইলেরও বেশি।'

'অসম্ভব!'

'তাহলে আমিই যাব।'

'তুই!'

'হ্যাঁ, আমি,' উঠে চলে গেল জেন।

এরপর থেকে এজনরের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিল জেন। সবই বুঝলেন এজনর। যেচে এসে জেনের সঙ্গে আফ্রিকায় যাবার কথা উত্থাপন করলেন কিন্তু চুপ করে রইল জেন, উঠে চলে গেল সেখান থেকে। ছোট খালা রেগে গেছে দেখে আফ্রিকা অভিযানের কষ্টকে আর গ্রাহ্য করলেন না এজনর। ঠিক করলেন, যাবেন। রাগ ভাঙলে জেন জানিয়ে দিল, সেও যাবে সঙ্গে। না, এজনরের কোন আপত্তি শুনবে না সে।

ভূগোলের ছাত্রী জেন। পৃথিবীর দুর্গম অঞ্চলগুলো সম্পর্কে এমনিতেই ভাল জ্ঞান আছে। ভাইয়ের নিরুদ্দেশ হবার পর থেকে আফ্রিকা, বিশেষ করে জর্জকে যেখানে মারা হয়েছে বলে অনুমান করা হয় সেই অঞ্চল সম্বন্ধে আরও গভীর ভাবে পড়াশোনা করছে। এমন কি ওখানকার 'বামবারা' ভাষা পর্যন্ত শিখেছে। এজনর যেতে রাজি হতেই তাঁকেও জোর করে শিখিয়েছে ভাষাটা। লোভও দেখিয়েছে অবশ্য। বলেছে, নাইজার নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়, ওখানে বড়শি ফেলার

আশায় দিন রাত হাঁ করে থাকে মাছেরা। টোপ লাগেই না, খালি বড়শি লুফে নেয়। এবং ওই মাছ কোথায় পাওয়া যায়, জানে শুধু জঙলীরা। ওদের সঙ্গে কথা বলতে হলে বামবারা ভাষাটা শিখতেই হবে। ভূগোলের কিছুই জানেন না এজনর। খালার কথা বিশ্বাস করলেন, কষ্ট করে শিখেই ফেললেন শেষ পর্যন্ত ভাষাটা।

এবার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোগাড়ের পালা। জঙলীদের বশ করার নতুন ফন্দী বের করেছে জেন। অস্ত্রশস্ত্রের ওপর খুব একটা ভরসা নেই তার। তাই জঙলীদের উপহার দিয়ে বশ মানানোর জন্যে সঙ্গে নিল রঙিন পুঁতির মালা, রুমাল, ছুঁচ, ফিতে, বোতাম, পেন্সিল, পুরানো বাজে বন্দুক ইত্যাদি। অভিযানের প্রয়োজনে নিল ওষুধপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, টেলিস্কোপ, কম্পাস, তাঁবু, ম্যাপ, রান্নার জিনিসপত্র, প্রচুর পরিমাণে খাবার ইত্যাদি। এজনর সারাদিন বাজারে বাজারে ঘুরে কিনে আনলেন ডজনখানেক বিভিন্ন সাইজের ছিপ, প্রচুর পরিমাণে সুতো, বড়শি আর মাছ ধরার অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

মুচকে হাসল জেন। বলল, 'কিনলে তো, মামা, গেলে মাছও মিলবে, কিন্তু তাঁবুতে আনতে পারবে তো?'

'কেন, কেন? কেন পারব না? জঙলীরা ছিনিয়ে নেবে?' প্রায় আঁতকে উঠলেন এজনর।

'আরে না না, সেজন্যে নয়। যা ভুলো মন তোমার। হয়তো ছিপ ফেলে ওপারের হরিণের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলে। এদিকে টোপ খেয়ে ছিপ সুদ্ধই নিয়ে চলে গেল মাছে, তোমার খেয়াল নেই। কিংবা মাঝে মাঝেই যেমন হয়, হয়তো দয়া উথলে উঠল তোমার। মাছ ধরে আবার ছেড়ে দিয়ে চলে এলে। তাহলেই তো মাছ খাওয়া হলো। ওই বিদেশ বিভুঁয়ে জলে-জঙ্গলে তো আর তোমার সঙ্গে নদীর পাড়ে বসে থাকতে পারব না আমি।'

'আরে না না। ভয় নেই। মাছ ধরে ছেড়ে দেয়ার অভ্যেস নেই আর আমার এখন,' অভয় দিলেন এজনর।

'সে হলেই ভাল।' মুচকে হেসে উঠে কাজ করতে চলে গেল জেন।

সমস্ত জিনিসপত্র কিনে তৈরি হয়ে নিয়ে বাবার কাছে বিদায় নিতে গেল জেন। জানালার ধারে বসে দূরে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছেন লর্ড ব্লেজন। মেয়ের আফ্রিকা যাবার কথা শুনলেন চুপচাপ। কোন ভাবান্তর দেখা গেল না তাঁর মধ্যে। প্রায়ই দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ায় মেয়ে, ভূগোল শিক্ষার প্রয়োজনে। সঙ্গে অবশ্যই এজনর থাকেন। বাধা দেন না ব্লেজন, আজও দিলেন না। হয়তো দিতেন, যদি জানতেন কি ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে মেয়ে।

'তুই তো যাচ্ছিস, এজনর, নাকি?' পাশে বসা নাতিকে জিজ্ঞেস করলেন ব্লেজন।

'আমি না গেলে চলে কি করে? সেটা আবার জিজ্ঞেস করছ!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে যা ; তুই সঙ্গে গেলে আমার কোন চিন্তা নেই,' বলেই আবার দিগন্তে চোখ ফেরালেন।

বাবাকে আর বিরক্ত না করে বেরিয়ে এল জেন। সঙ্গে সঙ্গে এজনরও।

স্টেশনে গাড়ি ছাড়বে, হঠাৎ হাঁ হাঁ করে উঠলেন এজনর. 'খালা, এ ট্রেনে

কিছুতেই যাওয়া চলে না।'

'কেন, কি হলো আবার, এজনর?' অবাক হলো জেন।

'না, কিছু না,' আমতা আমতা করতে লাগলেন এজনর। 'মানে, মানে আমার ছিপগুলো ফেলে এসেছি কিনা ভুলে···।'

হো হো করে হেসে উঠল জেন। বলল, 'শুরুতেই এই অবস্থা! এবারে আর মাছের মুখ দেখব না, বোঝাই যাচ্ছে। চলো, নামি।'

বড় ভাইয়ের বদনাম ঘোচাতে বাড়ি থেকে দুর্গম যাত্রায় রওনা হলো জেন। কিন্তু তখন কি সে ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পেরেছিল, যে ক'দিন পরেই ডাকাতদলের সঙ্গে ছোট ছেলের যোগসাজসের কথা শুনে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হবেন তার বাবা লর্ড ব্লেজন?

চার

অদ্ভুত প্রবন্ধটা লা এক্সপ্যানসন ফ্রাঁসে পত্রিকায় ছাপা হলো পহেলা জানুয়ারি। লিখেছেন পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা আমিদী ফ্লোরেন্স:

বারজাক মিশন

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

ডিসেম্বর ১। জঙ্গল। আগেই জানিয়েছি, আজ ভোর ছ'টায় যাত্রা শুরু করবে বারজাক মিশন। মিশনের আটজন সদস্য ছাড়াও আমাদের সঙ্গে আছেন দু'জন স্বেচ্ছা অভিযাত্রী। এদের মধ্যে একজন ইংল্যান্ডে শিক্ষিতা সুন্দরী ফরাসী তরুণী মিস জেন ব্লেজন। অন্যজন তাঁর মামা (বোনপোও ডাকে মাঝে মাঝে, বড় গোলমেলে সম্পর্ক—ঠিক রাখতে পারছি না) এজনর দ্য সেন্ট বেরেন। মাথায় ছিট আছে ভদ্রলোকের, কিন্তু দারুণ ভাল মানুষ আর হাসিখুশি। আশা করছি যাত্রাপথে আমাদের আনন্দেই রাখবেন তিনি।

দু'জন নিগ্রো চাকর এনেছেন তাঁরা সঙ্গে, গাইডের কাজ করবে। আর দোভাষীর কাজটা বেশ ভালমতই চালাতে পারবেন মামা-ভাগ্নী। বামবারা আর স্থানীয় অনেক ভাষাই নিখুঁত বলতে পারেন দু'জনে। এই তো, আজই সকালে, আমাকে দেখে 'গুড মর্নিং' না বলে 'ইনিতি' বলেছেন মিস্ ব্লেজন। শুনে শুনে ভাষাটা শিখে ফেলার চেষ্টা করছেন মঁসিয়ে বারজাক। কিন্তু তাঁর মুখে কেমন যেন হাস্যকর ঠেকে ভাষাটা।

ভোর সাড়ে পাঁচটা। রেসিডেন্সির সামনের চত্বরে জড়ো হলাম আমরা।

সৈন্য দেখিয়ে জঙ্গলীদের ভড়কে দেয়ার ইচ্ছে নেই মঁসিয়ে বারজাকের। মিস্ ব্লেজনও এসবের পক্ষপাতী নন। দু'জনেই চান শান্তির বাণী বয়ে নিয়ে যেতে, হাতে তাঁদের শান্তির অলিভশাখা। ওদিকে বেঁকে বসেছেন মিশনের ডেপুটি চীফ মঁসিয়ে বদ্রিয়ার্স। গভর্নরও তাঁর দলে। তাঁরা চান, সৈন্য সঙ্গে থাকতেই হবে। নইলে ফরাসী সরকারের মান থাকে না। তাছাড়া বছর দশেক ধরেই, বিশেষ করে

নাইজার অঞ্চল থেকে রহস্যময় সব অভ্যুত্থানের খবর আসছে। লুটতরাজ, খুন-জখম অবাধে চালাচ্ছে ডাকাতের দল। গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালাচ্ছে লোকে। কাজেই অভিযাত্রী দলের সঙ্গে সৈন্য থাকা একান্ত দরকার।

সুতরাং দু'শো সৈন্য নিয়ে আমাদেরকে পাহারা দেবেন ক্যাপ্টেন মারসিনে। ব্যবস্থা করলেন গভর্নর। এতে দারুণ খুশি হয়েছেন বদ্রিয়ার্স। অন্যদিকে বারজাকের মুখ গোমড়া।

আমাদের পথপ্রদর্শক একজন নিগ্রো। এককালে সেনাবাহিনীতে নেটিভ অফিসার ছিল। মলিন ইউনিফর্মটা ফেলে দিতে পারেনি চাকরি ছাড়ার পরেও, রেখে দিয়েছে। বিশেষ কোন অনুষ্ঠান কিংবা কাজ পড়লেই পরে ওটা। মাথায় সুতোর টুপি। সামনে বসানো পালকগুলো ঝরে গেছে অনেক আগেই। বুটজোড়া নিশ্চয়ই নষ্ট হয়ে গেছে। হাতে একটা কাঠের গদা। আগে অধীনস্থ সৈন্যদের পেটাত, এখন আর সৈন্য পাবে কোথায়, এখন গদা পড়বে কুলি-কামিনদের পিঠে। বেয়াড়াপনা করলে ঘোড়াগুলোও রেহাই পাবে না। লোকটার নাম মোরিলিরে।

মজার ব্যাপার, মিস্ ব্লেজনের একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই আছেন মঁসিয়ে বারজাক আর ক্যাপ্টেন মারসিনে। তাঁদের সুখ-সুবিধের দিকে নজর রাখছেন। এই নিয়ে দলপতি আর সেনাপতির মধ্যে মন কষাকষি শুরু হলো বলে।

ওদিকে মঁসিয়ে বদ্রিয়ার্সের ব্যাপারটা একেবারেই উল্টো। মহিলাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না তিনি। মুখ কালো করে প্রথম দলের অগ্রভাগে বসে আছেন। তাঁর ঠিক পেছনেই ড. চাতোন্নে। ভূগোল বিশারদ আছেন ডাক্তারের পাশেই। মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তুমুল তর্ক জুড়ে দেবার তালে আছেন ডাক্তারের সঙ্গে। ভৌগোলিক কারণেই যে এই অতি উন্নত জাতিটার পতন অবশ্যম্ভাবী তা বোঝাতে চাইছেন। হাঁ-হুঁ করে সেরে দিচ্ছেন ডাক্তার।

এঁদের পেছনে আছে বিশাল কনভয়টা। পঞ্চাশটা গাধা, পঁচিশটা ঘোড়া—এর মধ্যে দশটা ঘোড়া এনেছেন মিস ব্লেজন। দু'পাশে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেনের অশ্বারোহী বাহিনী। এ রকম অবস্থানে থেকেই অভিযাত্রীদের পাহারা দিয়ে এগোবে। সবাইকে ঘিরে টহল দিয়ে ফিরছি আমি, খবরের সন্ধানে। কে কখন আবার কি মূল্যবান কথাটা বলে ফেলে আমার অজান্তে, তাই খুব ব্যস্ত রেখেছি নিজেকে।

সবার পেছনে রয়েছে মিস ব্লেজনের দুই চাকর, টোনগানে আর চৌমৌকি।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সবাই। কাঁটায় কাঁটায় ছ'টায় যাত্রা সংকেত হলো তোপধ্বনির মাধ্যমে। এত বড় একটা অভিযানে চলেছে ফরাসী সরকারের প্রতিনিধিরা, তোপধ্বনি না করলে মান থাকে? তিনরঙা পতাকা উত্তোলিত হলো রেসিডেন্সির ছাদে। সেই সঙ্গে ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা আর অন্যান্য পতাকাও উত্তোলিত হয়ে তির তির করে কাঁপতে লাগল বাতাসে।

জমকালো পোশাক পরে রেসিডেন্সির বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিদায় অভিনন্দন জানালেন গভর্নর। টুপি তুলে অভিনন্দনের উত্তর নিলাম আমরা। প্রত্যাভিবাদন জানালাম। গুরুগম্ভীর নাদে বেজে উঠল সেনাবাহিনীর ড্রাম আর বিউগল। বললে হয়তো হাসবেন, চোখে পানিই এসে গেল আমার।

এমন সময় হঠাৎ সবার টনক নড়ল।

আরে! সেন্ট বেরেন কোথায়? তাঁকে তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম সবাই।

কিন্তু আশ্চর্য! বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন মিস ব্লেজন। বরং উল্টো চটে গেছেন। বললেন, 'আমি দেখছি,' আমার পাশে এসে বললেন, 'একটু আমার সঙ্গে আসবেন, মঁসিয়ে ফ্লোরেন্স?'

গেলাম। ঘোড়ায় চড়েই। উনিও ঘোড়ায় চেপেই চললেন। অন্য কোনদিকে না গিয়ে সোজা সাগর-তীরের দিকে চললেন। গিয়ে দেখি ঠিকই। বালির ওপরে আরাম করে বসে আছেন মঁসিয়ে এজনর দ্য সেন্ট বেরেন। সরকারী অভিযানের তিনিও যে একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি তাঁর অবস্থা দেখে আদৌ বোঝার উপায় নেই। একজন নিগ্রোর সঙ্গে জোর তর্ক চলছে তাঁর, তর্কের বিষয়বস্তু, কয়েকটা নতুন ধরনের বড়শি। আমরা পৌঁছানোর আগেই তর্কে হেরে গেছেন তিনি! তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছেন। নিগ্রোটার সঙ্গে নৌকায় চেপে কোথাও যাবেন—হয়তো মাছ ধরতেই। আমরা আসতে আর সামান্য দেরি করলেই চলে গিয়েছিলেন তিনি।

কড়া গলায় ধমক দিলেন মিস ব্লেজন, 'এ-জ-ন-র!'

চমকে ফিরে চাইলেন সেন্ট বেরেন। খালার রাগত চেহারা দেখে থতমত খেয়ে গেলেন। হঠাৎই মনে পড়ে গেল, অভিযানে তাঁকেও যেতে হবে। দ্রুত বড়শিগুলো ঝোলা শার্টের পকেটে ঢুকিয়ে প্যান্টের পকেট থেকে একমুঠো খুচরো পয়সা বের করে নিগ্রোটার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। তারপরই ছুটলেন রেসিডেন্সির দিকে। আমাদের দিকে যেন আর খেয়ালই নেই তাঁর। পেছন থেকে হেসে ফেললেন মিস ব্লেজন, 'পাগল!' আমিও হাসলাম।

ঘোড়া ছোটালেন মিস ব্লেজন। আমিও চললাম। বেরেনের পাশে এসে বললেন, 'অত জোরে ছুটছ কেন, মামা, ঘেমে যাবে যে!'

একবার বোনপো সম্পর্ক হিসেবে ধমকাচ্ছেন, একবার মামা ডাকছেন। নাহ, মাথাটা খারাপই হয়ে যাবে আমার।

সেন্ট বেরেনকে ওভাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসতে দেখে দলের সবাই হেসে ফেলল। অত যে রাশভারী বদ্রিয়ার্স তিনিও মুখ টিপে না হেসে থাকতে পারলেন না। অবশ্য দেখল না কেউ, অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়েছেন মুখ সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু অত হাসাহাসির কোন কিছুই খেয়াল করলেন না সেন্ট বেরেন। নিতান্ত নিরীহ গলায় মঁসিয়ে বারজাককে বললেন, 'ইস, দেরি করিয়ে দিলাম আপনাদের।'

হো হো করে আরেক প্রস্থ হাসির ধূম পড়ল। এবারে নিজেও হেসে ফেললেন সেন্ট বেরেন। সত্যিই, অমন লোককে পছন্দ না করে পারা যায় না।

আরেক ফ্যাসাদ বাধালেন ঘোড়ায় ওঠার আগে বেরেন। হেঁট হয়ে জিন পরীক্ষা করতে গিয়ে পিঠে চোঙায় রাখা ছিপের খোঁচা লাগালেন পাশের এক গাধার পেটে। আচমকা বিচ্ছিরি খোঁচা খেয়ে ভড়কে গেল গাধাটা; লাফিয়ে হটতে গিয়ে পেছনের পায়ের লাথি লাগাল বেরেনের পায়ে, ছিটকে পড়ে গেলেন তিনি।

তাঁকে টেনে তোলার জন্যে হৈ হৈ করে এগিয়ে গেলাম আমরা কয়েকজন। কিন্তু তার আগেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন বেরেন। পায়ের ব্যথা ভুলে গিয়ে আগে

ছিপ পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন, ভেঙে-টেঙে গেল কিনা। নাহ্, ভাঙেনি। নিশ্চিন্ত হলেন বেরেন।

মুখ টিপে হাসল টোনগানে। বলল, 'কপাল ভাল আমাদের। রওনা দেবার আগে বোলতায় কামড়ালে কিংবা গাধায় লাথি মারলে শুভযাত্রা।'

কোন উত্তর দিলেন না সেন্ট বেরেন। টোনগানের কথা যেন শোনেননি, এমনিভাবে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলেন।

সূর্য উঠেছে। গাছপালার মাথায় আর সামনের রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে সোনালী রোদ। বোঝাই যাচ্ছে, বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া ভাল থাকবে।

যাত্রা শুরু হলো আমাদের। একটা ছোট নদী পার হলাম বেলা দশটা নাগাদ। এই অঞ্চলে নদীর কোন সীমা-সংখ্যা নেই। রোজই দুটো একটা নদী পড়বে পথে। সুতরাং বার বার নদী পার হবার কথা বলে বিরক্ত করব না।

কোনাক্রি থেকে সোজা সড়ক ধরে চলেছি। পথের পাশে পাহাড়ের ঢালে ঢালে জঙ্গল পরিষ্কার করে ভুট্টা, কলা আর তুলোর চাষ করা হয়েছে। আশে পাশে অসংখ্য গ্রাম। ইচ্ছেমত গ্রামগুলোর নামকরণ করে চলেছেন মঁসিয়ে তাসিন।

এই সকাল বেলাতেই বেশ গরম লাগছে। যাত্রা করে এ পর্যন্ত মাইল বারো পথ এসেছি। ঠিক হলো, একনাগাড়ে চলব আমরা। খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু হবে চলা। পরিশ্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত এগিয়েই যাব, রাত যত হয় হবে। এভাবে চলবে রোজ।

দুপুর নাগাদ ছোটখাট এক বনের ধারে এসে দাঁড়ালাম। এবারে থামব। মনোরম পরিবেশ। বিশ্রামের জন্যে চমৎকার জায়গা। এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল সৈন্যরা। গাছপালায় ঘেরা ছোট্ট একটু খোলামত জায়গায় চলে এলাম আমি, মিস ব্লেজন, সেন্ট বেরেন আর ক্যাপ্টেন এবং আমাদের দেখাদেখি দলের অনেকেই।

ঘোড়ার পিঠ থেকে একটা গদি নিয়ে মাটিতে পেতে দিলাম, মিস ব্লেজনের বসার জন্যে। ওদিকে ছোট ছোট দুটো টুল এনে হাজির করেছেন ক্যাপ্টেন আর বারজাক। বিপদে পড়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। কার পেতে দেয়া আসনে বসে কাকে অসন্তুষ্ট করবেন। শেষ পর্যন্ত আমার পেতে দেয়া গদিতেই বসে পড়লেন। বললেন, 'আপনারা দু'জন কিছু মনে করবেন না। এতক্ষণ ঘোড়ার পিঠে থেকে থেকে শরীরে ব্যথা হয়ে গেছে। মাটিতে, এই গদিতে হাত-পা ছড়িয়ে একটু আরাম করে বসতে পারব।'

ক্যাপ্টেন আর বারজাক চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। শেষে আমার দিকে এমন ভাবে চাইলেন যেন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবেন।

পা ছড়িয়ে ঘাসের ওপর বসলেন মঁসিয়ে বদ্রিয়ার্স, কুইরো, হেইরো আর পসিঁ। শেষের তিন ব্যক্তি নির্দলীয়। সঙ্গে আসার হুকুম হয়েছে, এসেছেন। রওনা হওয়ার পর থেকে ফাঁক পেলেই খাতায় কি সব লিখছেন মঁসিয়ে পসিঁ। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে আমার, লোকটা হয় অসাধারণ মেধাবী, নয়তো অকাট মূর্খ। এখন কোন্‌টা যে তা আল্লাই জানেন। অপেক্ষা করা যাক, হয়তো আমিও জানতে পারব।

সারাক্ষণই জোড় বেঁধে আছেন ডক্টর চাতোন্নে আর মঁসিয়ে তাসিন। এখন বসেছেন একটা ডুমুর গাছের ছায়ায়। বসেই ম্যাপ বিছিয়েছেন তাসিন। দু'জনেরই

খাওয়া চুলোয় গেল, এতই তন্ময় হয়ে পড়লেন ম্যাপ নিয়ে।

আবার কোথায় গায়েব হয়ে গেছেন সেন্ট বেরেন। ওঁর ছায়াও নজরে পড়ছে না।

আগুন জ্বেলে রান্নার আয়োজন করছে গাইড মোরিলিরে, তার সঙ্গে হাত লাগিয়েছে চৌমৌকি আর টোনগানে।

এগিয়ে গেলাম। কি খাওয়া হবে এ বেলা জানতে চাইলাম। কোনাক্রি থেকে আনা মাংস দেখাল আমাকে মোরিলিরে, হাসল। বলল, 'দারুণ জিনিস, মঁসিয়ে। ভেড়াটা একদম কচি।'

দেখেশুনে এ বেলার খাওয়াটা ভালই হবে মনে হলো। মাখন দিয়ে ভাজা ভেড়ার মাংস, ভুট্টার কেক, বন থেকে জোগাড় করা ডুমুর, কলা, নারকেল। সবশেষে তালের রস গ্যাঁজান তাড়ি, অবশ্যই ঝর্নার ঠাণ্ডা, পরিষ্কার পানি মেশানো। নইলে এই ভর দুপুরে মাতলামি শুরু করবে সবাই।

এই সময় আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন ডক্টর চাতোন্নে। মাখনটা দেখে খুশি হলেন খুব। এতক্ষণে জানলাম যে, গরুর দুধ থেকে নয়, এটা তৈরি হয়েছে একজাতের গাছের ফল থেকে। এই গাছের দুই নাম: কেউ বলে সি, কেউ বলে ক্যারাইট।

ডাক্তারের কথা শুনছি, হঠাৎ কে যেন প্রাণপণ চিৎকার করে উঠল।

বিন্দুমাত্র দেরি না করে ছুটলাম শব্দ লক্ষ্য করে। আগে আমি, পেছনে ক্যাপ্টেন আর বারজাক। বনের প্রান্তে একটা ছোট্ট ডোবার ধারে পৌঁছে দেখলাম, কাদাপানিতে কোমর ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেন্ট বেরেন।

ভয় পেয়ে গেলাম। নিশ্চয়ই চোরাকাদা। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ক্যাপ্টেন, জলদি একটা দড়ির ব্যবস্থা করুন। চোরাকাদায় পড়েছেন উনি।'

'আরে না, না। চোরাকাদা নয়। এমনি কাদা, তবে সাংঘাতিক আঠালো। পা তুলতে পারছি না। পিছলে পড়ে গেছি।'

'কি করছিলেন এখানে?'

'মাছ ধরছিলাম।'

'ছিপ, ছিপটা কোথায়?'

'ছিপ কেন!' অবাক হলেন যেন বেরেন, 'হাত দিয়েই তো ধরা যায় এই কাদায়।'

'তা পেয়েছেন?'

'মাছ না, তবে তোফা জিনিস পেয়েছি,' বলে প্যান্টের ভেতরে নিচের দিক ঢুকিয়ে দেয়া জ্যাকেটটা দেখালেন, 'এর ভেতরে আছে।'

'কি আছে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'আরে, সাহেব, আছে, আছে,' রহস্যটা ভাঙলেন না সেন্ট বেরেন। 'দেখলেই জিভে পানি এসে যাবে। কিন্তু আগে তুলুন তো আমাকে।'

তিনজনে মিলে টেনেহিঁচড়ে কোনমতে বেরেনকে ডোবা থেকে তুলে আনলাম।

'আরে বেশি টানাটানি করবেন না। জ্যাকেটের ভেতর থেকে ব্যাটারা পালাবে যে!' হাঁ হাঁ করে উঠলেন সেন্ট বেরেন।

'আরে কোন্ ব্যাটারা পালাবে, বলবেন তো?' অধৈর্য হয়ে উঠলাম আমি।

'ব্যাঙ, সাহেব, ব্যাঙ।'

বুঝুন কাণ্ড। রোদে গরমে অস্থির হয়ে এসে হাত-পা ছড়িয়ে জিরিয়ে কুল পাচ্ছি না আমরা, আর বেরেন কাদার মধ্যে মাছ ধরতে এসে মাছ না পেয়ে ব্যাঙ ধরছেন, আবার লোভ দেখাচ্ছেন যে দেখলে নাকি আমাদের জিভে পানি এসে যাবে।

'তা, ভাল করেছেন। ভেরি গুড,' বললেন বারজাক, 'খাইনি কখনও, তবে ব্যাঙের মাংস খেতে ভালই শুনেছি। কিন্তু যে রকম চেঁচাচ্ছে ওগুলো, খাদ্য হবার ইচ্ছে আছে বলে মোটেই মনে হচ্ছে না।'

'হবে, হবে, না হয়ে যাবে কোথায়?'

কেটেকুটে নিজেই ব্যাঙের রোস্ট বানালেন সেন্ট বেরেন। সত্যিই চমৎকার লাগল খেতে। সবাই তারিফ করল মাংস আর রান্নার।

সবশেষে কফি খেয়ে ঘাসের ওপরই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল অভিযাত্রীরা। মেয়েমানুষ, সবার সামনে তো আর শুতে পারেন না মিস ব্লেজন, খানিক দূরে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে শুলেন।

বিকেল পাঁচটায় আবার রওনা হবার কথা, কিন্তু কিছুতেই রাজি করানো গেল না কুলিদের। আজব সমস্যা। চাঁদ ওঠার আগে কিছুতেই রওনা দেবে না ওরা, অমঙ্গল নাকি হয়।

কুলিদের সঙ্গে সায় দিয়ে বললেন মঁসিয়ে তাসিন, 'ঠিকই বলছে কুলিরা। আমাদের আগের অনেক আফ্রিকা-অভিযাত্রীই এ বিষয়ে লিখে গেছেন। সত্যিই নাকি অমঙ্গল হয়।'

এতে আরও পেয়ে বসল কুলিরা। যারা এতক্ষণ নিমরাজি ছিল, তারাও একেবারে হাত-পা ছড়িয়ে বসল। কয়েকজন তো শুয়েই পড়ল আরও কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেবার জন্যে।

বোকার হদ্দগুলোর জন্যে পুরো দুটো ঘণ্টা খামোকা নষ্ট হলো আমাদের।

এক সময় চাঁদ উঠল। আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল কুলির দল। আবার চলা শুরু হলো আমাদের।

আরেকটা জঙ্গলের ধারে এসে পৌঁছলাম রাত ন'টা নাগাদ। জঙ্গলে ঢোকার পথেই একটা কুঁড়েঘর। ভেতরে উঁকি মেরে দেখলেন ক্যাপ্টেন। খালি কুঁড়ে। মিস ব্লেজনের রাত কাটাতে সুবিধে হবে বলে এখানেই থামার প্রস্তাব করলেন ক্যাপ্টেন। সবাই রাজি হলো।

তাঁবু ফেলা হলো। রাতের খাবারের পর শোবার পালা। যার যার তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়লেন অভিযাত্রীরা। মিস্ ব্লেজন গেলেন কুঁড়েঘরে। ক্যাপ্টেন আর সৈনিকেরা পালা করে রইল পাহারায়।

দশ মিনিটও পেরোয়নি, হঠাৎ কুঁড়েঘরের ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। তাঁবু থেকে বেরিয়েই ছুটলাম সেদিকে। আমার আগেই ঘরের দরজার কাছে চলে গেছেন ক্যাপ্টেন। ভেতরে ঢুকে দেখলাম এককোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছেন মিস্ ব্লেজন। তাঁর মুখে আতঙ্ক।

কি হয়েছে, আমরা জিজ্ঞেস করতেই আঙুল দিয়ে মেঝের দিকে নির্দেশ করলেন। দেখলাম এক ধরনের কুৎসিত সাদা পোকা শ'য়ে শ'য়ে কিলবিল করছে। মাটিতে অসংখ্য গর্ত। গর্তের ভেতর থেকেই বেরিয়ে এসেছে পোকাগুলো। মিস ব্লেজনের দোষ দেব কি, দেখে আমারই গা ঘিনঘিন করে উঠল। শিউরে উঠলাম নিজের অজান্তেই।

অন্যদের সঙ্গে টোনগানেও এসে দাঁড়িয়েছে কুঁড়ের ভেতরে। কিন্তু পোকাগুলোকে দেখে তার সে কি আনন্দ! আমরা তার অত খুশির কারণ জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, 'খুশি হব না! এমন দারুণ জিনিস সব সময় জোটে নাকি? ওগুলো মচমচে করে ভাজলে খেতে যা লাগে না!' বলেই বেরিয়ে গেল সে। বোধহয় পোকাগুলোকে তুলে নেবার জন্যে ঝুড়িটুড়ি কিছু আনতে।

ওয়াক, ওয়াক করে বমি করে ফেললেন মিস ব্লেজন, টোনগানের কথা শুনেই আমারও অবস্থা বিশেষ ভাল নয়।

এরপর আর ওই ঘরে মিস ব্লেজনের থাকা চলে না। নতুন তাঁবু খাটাতে হবে। বেরিয়ে এলাম।

নতুন তাঁবু খাটানোর কথা শুনেই প্রস্তাব করল গাইড মোরিলিরে; কাছেই, বড়জোর পঞ্চাশ গজ দূরে, একটা গ্রাম আছে, সেখানে এক নিগ্রো চাষা তার চেনা। লোকটার বৌয়ের কুঁড়েঘরে ইচ্ছে করলে থাকতে পারেন মিস ব্লেজন। বললেই ঘর ছেড়ে দেবে নিগ্রো-বৌ, কিন্তু কিছু পয়সা দিতে হবে।

কি ভেবে রাজি হয়ে গেলেন মিস ব্লেজন। আসলে বোধহয় তাঁবুতে থাকতে ভাল লাগছিল না তাঁর।

দল বেঁধে মিস জেন ব্লেজনকে এগিয়ে দিতে গেলাম। কোথায়, কেমন জায়গায় থাকতে যাচ্ছেন তিনি, সেটাও আমাদের দেখা কর্তব্য।

বৌটার বয়েস মাত্র বছর পনেরো হবে। মোরিলিরের ডাক শুনে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল। ছোট্ট এক টুকরো কাপড় পেঁচিয়ে রেখেছে শুধু কোমরে।

আমাদের দেখেই হাসল মেয়েটি। সবাইকে অবাক করে দিয়ে পরিষ্কার ফরাসী ভাষায় অভ্যর্থনা জানাল। ভাষা কোথায় শিখল জিজ্ঞেস করতেই বলল, 'এক ফরাসী সাহেবের বাড়িতে অনেক দিন ঝি-গিরি করেছি। ওই সাহেবই আমাকে স্কুলে কয়েক ক্লাস পড়িয়েছিলেন।'

মিস জেনের থাকার ব্যবস্থা হবে কিনা মোরিলিরে ওকে জিজ্ঞেস করতেই বলল, 'হবে, নিশ্চয়ই হবে। আর বিছানা কি করে পাততে হয়, আমি ভাল করেই জানি। আপনার কোন অসুবিধে হবে না, মা। আসুন।'

মিস ব্লেজনের হাত ধরে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল বৌটা। আমরাও সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে এলাম।

কিন্তু আধঘণ্টা যেতে না যেতেই মিস ব্লেজনের তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল আবার। ক্যাপ্টেনকে ডাকছেন। 'ক্যাপ্টেন মারসিনে, জলদি আসুন! আ-সু-ন!'

আবার ছুটলাম। এবারেও আমাদের আগেই পৌঁছে গেছেন ক্যাপ্টেন। ঘরের দরজায় ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে আছেন মিস ব্লেজন।

আমরা কাছে যেতেই আঙুল দিয়ে ঘরের ভেতরে নির্দেশ করলেন। উঁকি

দিলাম। এক বীভৎস দৃশ্য। মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে নিগ্রো মেয়েটা। তার সারা পিঠ রক্তাক্ত। পাশে দাঁড়িয়ে এক ভয়ঙ্কর চেহারার নিগ্রো। হাতে লিকলিকে একটা বেত। টকটকে লাল চোখ তুলে চাইল আমাদের দিকে, হাতের বেতটা বাতাসে নাচাল।

ফিরে মিস ব্লেজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কি? খেপেছে কেন নিগ্রো দানব?'

'বিছানা পেতে দিয়েছে মালিক,' হাত তুলে নিগ্রো মেয়েটাকে দেখালেন মিস ব্লেজন। 'সবে শুয়েছি, ঘুমও এসেছে, এমন সময় কোত্থেকে ঘরে এসে ঢুকল দানবটা। হাত ধরে টান মেরে মেয়েটাকে বিছানা থেকে তুলেই কিলঘুসি মারতে আরম্ভ করল। তারপর মাচা থেকে ওই বেতটা পেড়ে নিয়ে সমানে চাবকাতে শুরু করল ওকে।'

বদ্রিয়ার্স আর বারজাকও এসে দাঁড়িয়েছেন। বারজাকের দিকে চেয়ে মুখ বাঁকালেন বদ্রিয়ার্স। বললেন, 'এই অসভ্যগুলোকেই ভোটাধিকার দিতে চাইছেন আপনি!'

বদ্রিয়ার্সের কথায় মোটেই দমে গেলেন না বারজাক। পাল্টা জবাব দিলেন, 'বৌ ঠেঙালেই লোক অসভ্য হয়ে যায় নাকি? ফরাসীরা যে এত সভ্য, তারাও তো বৌ পেটায়।'

বলেই নিগ্রোটার দিকে ফিরে ধমক লাগালেন বারজাক, 'এই হতভাগা? মেয়েটাকে অমন বেধড়ক পেটাচ্ছিস কেন? ভাল চাস তো, থাম। নইলে পিটিয়ে তক্তা করে দেব।'

কিন্তু মোটেই ভয় পেল না নিগ্রো। দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'থামব, তোমার কথায়? ও আমার বৌ নয়, বাঁদী, বাঁদী। উচিত দামের চেয়ে বেশি দিয়ে কিনেছি। ওকে খাটানোর কিংবা পেটানোর পুরো অধিকার আমার আছে। তুমি কথা বলতে আসার কে, শুনি?'

অমন পাল্টা আক্রমণ আশা করেননি বারজাক। একটু দমে গেলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনস্থির করে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, মালিককে কিনব আমরা। কত চাস?'

'একটা গাধা, বন্দুক একটা, আর পঞ্চাশ ফ্রাঁ।'

'হারামজাদা রাজ্য বিক্রি করছিস নাকি?' এবারে কথা বললেন ক্যাপ্টেন। হাতের মিলিটারি বেতটা দোলাতে দোলাতে এগিয়ে এলেন, 'বেশি তেড়িমেড়ি করলে পিটিয়ে ভূত ভাগাব। তারপর ধরে নিয়ে গিয়ে ঝোলাব ফাঁসিতে।'

ভয় পেয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দর কমাতে রাজি হলো নিগ্রো দানব। রফা হলো, মান্ধাতার আমলের একটা গাদা বন্দুক, এক টুকরো কাপড় আর বিশ ফ্রাঁয়ের বিনিময়ে বেচে দেবে মালিককে।

ওদিকে কথাবার্তা চলাকালীনই মালিকের শুশ্রূষায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন মিস ব্লেজন। ক্যারাইট মাখন ঘসে দিয়েছেন ইতোমধ্যেই ওর পিঠে। বাঁদী হাত বদল হয়ে গেলে তাকে তুলে তাঁবুতে নিয়ে এসে কিছু টাকা আর কাপড় দিয়ে বারজাক বললেন, 'যা, আজ থেকে তুই মুক্ত।'

কেঁদে ফেলল মালিক, তাঁবু থেকে বেরোবার নামও করল না। বরং মিস ব্লেজনের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'কোথায় যাব, মা? আবার কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে বাঁদীই বানাবে। ওই শয়তানগুলোর বাঁদী হওয়ার চেয়ে আপনার কাছে থাকা অনেক ভাল। দয়া করে আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না।'

মেয়েটার কাকুতি মিনতিতে গলে গেলেন সেন্ট বেরেন। ভাগ্নীকে বললেন, 'কি আর করা, রেখে দে। কাজে লাগবে।'

'থাক তাহলে,' বললেন মিস ব্লেজন।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সেন্ট বেরেনকে জড়িয়ে ধরল মালিক। চপাচপ কয়েকটা চুমো খেয়ে ফেলল বেরেনের দুই গালে।

'আরে করিস কি, করিস কি, ছাড় ছাড়!' বলে জোর করে মালিককে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দরজার দিকে ছুটলেন বেরেন। বার বার পেছনে ফিরে চাইছেন আবারও আসছে কিনা মালিক। কৃতজ্ঞতা স্বীকারের এই অদ্ভুত রীতি দেখে রীতিমত ভড়কে গেছেন তিনি।

কাণ্ডটা আমরা দেখছিলাম। হাসির হুল্লোড় উঠল।

মালিককে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন মিস ব্লেজন। তাঁর জন্যে তাঁবু খাটানোর হুকুম দিলেন ভৃত্যদের। দরকার হলে বাইরে রাত কাটাবেন, তবু আর কোন কুঁড়েতে থাকবেন না তিনি, আমাদের সামনেই শপথ নিলেন।

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা এখানেই শেষ।

—আমিদী ফ্লোরেন্স

পাঁচ

বারজাক মিশন
(বিশেষ সংবাদদাতার খবর)

ডিসেম্বর ১৬, দাউহেরিকো।

২ ডিসেম্বর ভোর পাঁচটায় তাঁবু গোটালাম আমরা। বেশ খুশি খুশি লাগছে মালিককে। সারাক্ষণই হাসছে। রাস্তা ভাল, কিন্তু চলার পথের গ্রামগুলোর অকল্পনীয় দারিদ্র্য বড় বেশি পীড়া দিচ্ছে চোখ আর মনকে। দু'ধারে বেশির ভাগ জমিই সমতল। দূরে অবশ্য টিলাটক্কর যথেষ্ট আছে। জমিতে ছোট ছোট গাছ, আগাছা আর দু'তিন গজ লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গল। মাঝে মাঝে বেশ কিছু জায়গা জুড়ে আগাছা পুড়ে কালো হয়ে রয়েছে, মাটি বেরিয়ে পড়েছে। দাবানলের প্রকোপ। জায়গায় জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ করা হয়েছে।

আশেপাশের গ্রামগুলোর নাম বড় অদ্ভুত। ফোনগৌমবি, মানফৌরো, কাফৌ, ঔসৌ, এমনি সব নাম। উচ্চারণ করতেই জান বেরিয়ে যাবার যোগাড়। আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি। কোন গ্রামের কি নাম আর জিজ্ঞেস করছি না এখন।

গ্রাম দেখলেই গিয়ে ঢুকছেন দুই চীফ। লোকজনদের এটা ওটা নানা কথা

জিজ্ঞেস করছেন। নিজেদের স্বপক্ষে প্রমাণ খুঁজছেন।

নদী পড়ছে পথে। তবে উল্লেখযোগ্য নয়।

সন্ধ্যা নামল বাউলিয়া গ্রামে। রাতের খাওয়া শেষে শুতে যাব, দেখি গেঞ্জি আর প্যান্ট খোলেননি এখনও সেন্ট বেরেন। শোবার জন্যে তৈরি হননি এখনও। না হোন, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু অবাক লাগল আমার কিটব্যাগ খুলে সমস্ত জিনিসপত্র মেঝেতে ছড়িয়েছেন দেখে—মেজাজ খিটখিটে। ব্যাপার কি?

আমাকে দেখতেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন সেন্ট বেরেন, 'অন্যমনস্ক লোক দু'চোখে দেখতে পারি না আমি।'

ভড়কে গেলাম। আমার ওপর খেপেছেন কেন বেরেন? আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি আবার করলাম, মঁসিয়ে বেরেন?'

'আরে না না, আপনি না, আপনি না। ওই ব্যাটা চৌমৌকিটা।'

'কি করল সে?'

'কি করেনি? পাজামাই পাচ্ছি না, কোথায় ফেলে এসেছে কে জানে। ব্যাগে নেই।'

'ভুল করছেন আপনি। ওই ব্যাগে আপনার পাজামা থাকার কথা নয়। ওটা আমার ব্যাগ।'

'অ্যাঁ,' নিজের ভুল বুঝতে পারলেন সেন্ট বেরেন। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়েই আমার সামনে এসে বার বার মাপ চাইতে লাগলেন ভুল করে ব্যাগটা খুলে ফেলেছেন বলে। তারপরেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন দ্রুত।

হাসলাম মনে মনে। যতই দিন যাচ্ছে, আরও বেশি ভাল লাগছে লোকটাকে।

ডিসেম্বর ৬। উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটল না। শুধু একটানা পথ চলা। রাতে তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম।

ডিসেম্বর ৭। এদিনেও দিনের বেলা ঘটল না কিছু। সন্ধ্যায় তাঁবু খাটানোর পর রান্নাবান্না শেষ হয়েছে। খেতে বসেছি, এমন সময় দেখলাম আশেপাশের গাছপালার আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে কয়েকজন নিগ্রো। ব্যাপার কি? দু'জন সৈন্যকে ডেকে কারণ জিজ্ঞেস করতে বললেন ক্যাপ্টেন মারসিনে। কিন্তু সৈন্য দু'জন এগিয়ে যেতেই সরে পড়ল নিগ্রোরা। কয়েক মিনিট পরেই আবার অন্যদিক থেকে উঁকি দিল। মতলবটা কি ব্যাটাদের!

এবার আর সৈন্য নয়, মোরিলিরেই এগিয়ে গেল। তাকে দেখে কিন্তু সরে পড়ল না নিগ্রোরা। হাত-মাথা নাড়িয়ে কি কথা বলল সে ওদের সঙ্গে। ফিরে এসে জানাল, এরা ব্যবসায়ী। জিনিসপত্র বেচতে এসেছে। পণ্য হলো মাটির বাসনপত্র, বাঁশ আর বেতের ঝুড়ি, লোহার বল্লম, তীর-ধনুক, কাঠের জিনিসপত্র ইত্যাদি।

'দুত্তোর, এসব দিয়ে কি হবে!' ঠোঁট উল্টে বললেন ডক্টর চাতোন্নে।

'আরেকটা জিনিস আছে,' বলল মোরিলিরে।

'কি?' নিস্পৃহভাবে জানতে চাইলেন ডক্টর।

'কোলা বাদাম।'

'অ্যাঁ! আরে, তাই নাকি! এতক্ষণ বলোনি কেন? কই, জলদি ডাকো ওদের।' বোঝা গেল, নাম শুনেই জিভে পানি এসে গেছে ডাক্তারের।

ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিয়ে আমরাও চেখে দেখলাম কোলা বাদাম। সত্যিই, জিভে পানি আসার মতই জিনিস। সামান্য নুনের বিনিময়ে প্রচুর কোলা বাদাম দিল আমাদের ব্যবসায়ীরা। এ অঞ্চলে নুন পাওয়া যায় না। এটা আগেই জানা ছিল। তাই আমাদের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ নুন নেয়া হয়েছে।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলো। আমাদের সঙ্গেই খেল ব্যবসায়ীরা। এরপর শুরু হলো নাচগান। বাদ্যযন্ত্র লাউয়ের খোল আর বাঁশী। যার যেভাবে খুশি বাজনা বাজাতে বাজাতে বিকট সুরে গান ধরল ওরা। নেচে চলল উদ্দাম গতিতে। নাচ মানে আকাশপানে কে কতটা জোরে লাফাতে পারে তার প্রতিযোগিতা।

আমাদের হাসি পেলেও সঙ্গের নিগ্রো কুলিরা কিন্তু দারুণ খুশি। একবাক্যে তারিফ করছে নাচের। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে ওরাও একে একে গিয়ে যোগ দিল নাচে। বাদ্যযন্ত্র তো আর নেই। তাই হাতের কাছে সসপ্যান, বাসন, বাটি, চামচ, হাতা যা পেল নিয়ে লাউয়ের খোল আর বাঁশীর সঙ্গে তাল মেলাল। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল আমাদের। হঠাৎ আর থাকতে না পেরে এগিয়ে গিয়ে নাচে যোগ দিলেন সেন্ট বেরেন। হাতে একটা ডিস আর চামচ নিয়ে নেমেছেন। নাচছেন তাধিন তাধিন। হাসির দমকে পেট চেপে ধরে বসে পড়লাম আমি। সমানে বেরেনকে বাহবা দিয়ে গেলেন বারজাক। গোমড়ামুখো বদ্রিয়ার্স পর্যন্ত মুচকে হাসলেন।

মাঝরাতে থামল নাচগান। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে খোলা আকাশের নিচে যে যেখানে নাচছিল, শুয়ে পড়ল নিগ্রোরা।

খালা-বোনপোও ঘুমাতে চললেন। হঠাৎই একটা দুর্বুদ্ধি চাপল মাথায়। আসলে সাংবাদিকের স্বাভাবিক কৌতূহল। কোন কিছু না ভেবেই মিস ব্লেজনের তাঁবুর গায়ে গিয়ে কান পাতলাম। ভেতর থেকে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

না, খালা-বোনপোতে কথা হচ্ছে না। হচ্ছে টোনগানের সঙ্গে মিস ব্লেজনের।

'টোনগানে, আজ পর্যন্ত তোমার সম্পর্কে ধরতে গেলে কিছুই জানি না। আর্মি থেকে বরখাস্ত হবার পরেও সেনেগালে থাকতে গেলে কেন? চাকরি নেবার সময় বলেছিলে যে পরে সময় করে বলবে।'

টোনগানে তাহলে বামবারা নয়! অবাক হলাম।

'ক্যাপ্টেন জর্জ ব্লেজনের জন্যে...'

ক্যাপ্টেন জর্জ ব্লেজন! নামটা চেনা মনে হলো।

'ক্যাপ্টেন ব্লেজন!' মিস জেন ব্লেজন যেন অবাক হলেন।

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন ব্লেজন। আমিও ছিলাম ওঁর দলে। হঠাৎই ইংরেজরা আমাদের ওপর চড়াও হয়ে গুলি চালাতে আরম্ভ করল।'

'কেন?'

'বিদ্রোহ করেছিলেন ক্যাপ্টেন ব্লেজন। খুনখারাপি, লুটতরাজ করে বেড়াচ্ছিলেন।'

'কি বলছ তুমি?'

'ঠিকই বলছি। গাঁয়ের পর গাঁ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছিলেন। মানুষ খুন করছিলেন অকাতরে। যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তাঁর দলের

লোকেরা। হাসতে হাসতে খুন করা হচ্ছিল বাচ্চাদের।'

'সব হচ্ছিল কি ক্যাপ্টেনের হুকুমে?'

'হ্যাঁ। তবে তিনি নিজে এসে কখনও হুকুম দেননি আমাদের। হঠাৎই কোত্থেকে একদিন আরেকজন ইংরেজ অফিসার এসে যোগ দেয় তাঁর দলে। তিনি আসার পরই এ ধরনের নারকীয় কাণ্ড করার হুকুম দেন ক্যাপ্টেন ব্লেজন। নতুন অফিসারের মুখ দিয়ে।'

'এই নতুন অফিসার কত দিন ছিলেন দলে?'

'মাস পাঁচ-ছয়।'

'কোথায় প্রথম তাঁর সঙ্গে দেখা হয় ক্যাপ্টেনের?'

'গভীর জঙ্গলে।'

'তাকে খুব খাতির করতেন ক্যাপ্টেন?'

'করতেন। যেন নিজের ভাই।'

'নাম মনে আছে লোকটার?'

হঠাৎই একটা প্রচণ্ড আওয়াজ হলো এই সময় বাইরে। যেন মেঘ ডাকল। আসলে কাছেই কোথাও থেকে গর্জন করে উঠেছে একটা সিংহ। চমকে উঠলাম। টোনগানের জবাবটা ঠিক শুনলাম না।

একটু চমকে উঠেছিলেন মনে হয় মিস ব্লেজনও। কিন্তু তাঁবুর ওপাশে থাকায় দেখলাম না, বুঝলামও না ঠিক। আবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'তোমাদের ওপর ইংরেজরা চড়াও হবার পর কি হলো?'

'উল্টোপাল্টা গুলি খেয়ে অধিকাংশই মারা গেল। আমি আর কয়েকজন কোনমতে জান বাঁচিয়ে জঙ্গলে পালালাম। লড়াই থেমে যাবার পর ফিরে এসে দেখি, কাতারে কাতারে পড়ে আছে আমাদের দলের সৈন্যদের লাশ। ক্যাপ্টেনও পড়ে আছেন ওদের সঙ্গে—মরা।'

অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন মিস ব্লেজন।

থামল না টোনগানে, 'ক্যাপ্টেন আর অন্যান্যদের লাশগুলোকে কবর দিয়ে সে জায়গা ছেড়ে চললাম আমরা। নানা জায়গা ঘুরে ঘুরে বছর পাঁচেক পরে এসে পৌঁছুলাম টিমবাকটুতে। কিছুদিন কাজ করলাম সেখানে। তারপরে গেলাম সেনেগালে। এরপর তো আপনারই চাকরি নিলাম।'

'তাহলে সত্যিই মারা গেছেন ক্যাপ্টেন ব্লেজন?' কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না মিস জেন ব্লেজন।

'আমি নিজে তাঁর লাশ কবরে নামিয়েছি।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর আবার প্রশ্ন করলেন মিস ব্লেজন, 'তাঁর কবরটা কোথায় তাহলে নিশ্চয়ই জানো তুমি?'

'নিজের হাতের উল্টো পিঠের মত জানি।'

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন মিস ব্লেজন, 'ঠিক আছে, শুতে যাও, টোনগানে।'

ক্যাপ্টেন ব্লেজনের নামটা চেনা চেনা লাগছিল। নিজের তাঁবুতে ফেরার পথে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল সব কথা বিদ্যুৎ চমকের মত। সেই ক্যাপ্টেন,

যার নাম এক কালে লোকের মুখে মুখে ফিরত। সাহসী, দেশপ্রেমিক আর সৎ বলে যাঁর খ্যাতি ছিল সারা ইংল্যান্ডে, এমন কি ফ্রান্সবাসীদেরও তাঁর নাম অজানা ছিল না। এমন একটা লোক নাকি হঠাৎ কোন কারণ ছাড়াই বিদ্রোহ করেন। অনেকেই বিশ্বাস করেনি সেকথা, আমিও করিনি। কিন্তু সেই ক্যাপ্টেনের নাম কেন এতদিন পরে টোনগানের মুখে! ব্লেজনকে নিয়ে মিস ব্লেজনেরই বা অত কৌতূহল কেন, বুঝতে পারলাম না।

ডিসেম্বর ৮। আরেক মজার কাণ্ড করে বসলেন সেন্ট বেরেন। তাঁবু তুলে রওনা দেবার পর কয়েক মিনিটও যায়নি, ঘোড়ার পিঠে চেপেই কেবল উহ্ আহ্ করতে শুরু করলেন ভদ্রলোক। প্রাণপণে নামার চেষ্টা করছেন ঘোড়ার পিঠ থেকে। কিন্তু কোমরে কি অসুবিধে হবার ফলে নামতেও পারছেন না। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সাংঘাতিক বেকায়দায় পড়েছেন। হলো কি? ফোঁড়া-টোঁড়া হয়নি তো যা ঘোড়ায় চেপে বসার সময়ে চাপ লেগে ফেটে গেছে?

দাঁড়ালাম আমরা। অনেক কষ্টে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলেন সেন্ট বেরেন। সমানে পাছা খামচাতে লাগলেন। 'কি হলো, কি হলো,' বলে এগিয়ে গেলাম আমরা।

'বড়শি, বড়শি,' বলে আবার খামচাতে লাগলেন বেরেন।

'বড়শি? পাছায় বড়শি বিঁধল কি করে?' অবাক হলাম।

'আরে ওই যে, ওই দিন নিগ্রোটার কাছ থেকে কিনেছিলাম! প্যান্টের পকেটেই রয়ে গিয়েছিল। এতদিন পরিনি তো, মনেই ছিল না। আজ পরেই তো এই বিপত্তি!' বিরক্তভাবে পাছার কাপড় খামচাতে খামচাতে বললেন, 'কমসে কম তিনটে বিঁধেছে!'

অনেক কষ্টে হাসি চাপলাম। কিন্তু শব্দ করেই হেসে ফেললেন মিস ব্লেজন। বললেন, 'তাও ভাল, মামা। মাছ কি করে বড়শি গেলে পরীক্ষা করতে গিয়ে গলায় যে বিঁধিয়ে বসোনি, এই যথেষ্ট।'

আশ্চর্য! রাগ তো করলেনই না এই অসাধারণ সরল লোকটা, উল্টে বরং লজ্জিত ভাবে হাসলেন। 'ঠিকই, কি যে ভুলো মন আমার!'

ওদিকে কিন্তু ছুরি বের করে ফেলেছেন ডক্টর চাতোম্নে। এগিয়ে গিয়ে প্যান্টের কাপড় কেটে মাংস চিরে বার করে আনলেন বড়শি তিনটে।

'আহ্ বাঁচালেন, ডক্টর!' স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললেন সেন্ট বেরেন, 'ধন্যবাদ।'

'এবার বুঝলেন তো, মুখে বড়শি বিঁধলে কেমন কষ্ট পায় মাছেরা?'

'কিন্তু ওরা যে খাদ্য। তা ঠিক আছে, এবার থেকে যতটা সম্ভব কম ব্যথা দিয়ে মাছ ধরতে চেষ্টা করব।' প্রতিজ্ঞা করলেন বেরেন।

এরপর আর কিছু বলার নেই, কাজেই চুপ করে গেলেন ডাক্তার। শব্দ করে হেসে উঠলাম আমরা কয়েকজন। অবাক হয়ে আমাদের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন বেরেন। যেন বুঝতে পারছেন না, এই কথায় হাসির কি আছে।

সেন্ট বেরেনের পাছার ক্ষতস্থানে ভালমত ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন ডাক্তার। তারপর কয়েকজন সৈন্য মিলে ধরে বেরেনকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিল। উদাসীর মত আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন বেরেন।

এরপরের তিনটে দিন আর উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটল না।

ডিসেম্বর ১২। বোরোনিয়া গ্রামে পৌঁছলাম আমরা। কম বয়সী মোড়ল দারুণ খাতির করল আমাদের। বিনিময়ে তাকে আমরা দিলাম নুন, কিছু বারুদ আর দুটো দাড়ি কামানোর ক্ষুর। পেয়ে খুশি আর ধরে না মোড়লের। আমাদের রাত কাটানোর জন্যে নিজের লোকজনদের দিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গাঁয়ের বাইরে কয়েকটা খড়ের কুঁড়ে বানিয়ে দিল। ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে মাটিতে কার্পেট পাতা হচ্ছে দেখে অবাক হলাম আমরা।

দাঁত বের করে হাসল মোড়ল, 'নইলে পোকার জ্বালায় ঘুমোতেই পারবেন না রাতে। বড্ড পোকা বেরোয় মাটি ফুঁড়ে।'

খুশি হয়ে মোড়লসুদ্ধ শ্রমিকদের সবাইকে একমুঠো করে কড়ি দিলেন মঁসিয়ে বারজাক। আনন্দে ধেই ধেই নাচ আরম্ভ করল নিগ্রোরা। সমানে থুথু ছিটাতে লাগল বারজাকের মুখে, গায়ে। তারপর সেই থুথু আবার হাত দিয়ে জায়গায় জায়গায় লেপটাতে লাগল। মহাবিপদে পড়ে গেলেন মঁসিয়ে বারজাক।

একগাল হাসি নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এলেন সেন্ট বেরেন। বললেন, 'চটবেন না, মঁসিয়ে বারজাক। আপনাকে সবচে বড় সম্মানে ভূষিত করছে নিগ্রোরা।'

সম্মানের বহর দেখে 'ওয়াক থু' করে বমিই করে ফেললেন মিস ব্লেজন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে হে হে করে হাসলেন মঁসিয়ে বদ্রিয়ার্স, 'এখনও তো জানেই না ওরা, ওদের ভোটাধিকার দেবার জন্যেই পাগল হয়ে ছুটে এসেছেন মঁসিয়ে বারজাক। তাহলে হয়তো আরও বেশি সম্মান জানাবার জন্যে গায়ে পায়খানাই ডলতে লেগে যাবে।'

কড়া চোখে বদ্রিয়ার্সের দিকে চাইলেন বারজাক, কিন্তু করার কিছুই নেই। সম্মান জানিয়ে নিগ্রোরা চলে যেতেই কুমিরের ভয় অগ্রাহ্য করে সোজা গিয়ে কাছের নদীতে ঝাঁপ দিলেন। আচ্ছা করে সাবান ডলে সারা শরীর ধুয়ে পরিষ্কার করলেন। ফিরে এসে বদ্রিয়ার্সকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, এতটা সম্মান এর আগে কেউ কখনও করেনি তাঁকে। হোক না থুথু মাখিয়ে, কিন্তু মনটা তো অকৃত্রিম।

ডিসেম্বর ১৩। সকাল সকালই টিম্বো পৌঁছুলাম। ঘর বলতে মাটির দেয়াল তোলা মাত্র কয়েকটা কুঁড়ে। গাঁয়ের বাইরে সবুজ মাঠ, গরু-ভেড়া চরছে। দেখেই বোঝা যায়, লোকগুলো অত্যন্ত গরীব। শিশুগুলো সবই হাড় জিরজিরে রুগ্ন। মেয়েগুলো কিন্তু সাংঘাতিক বেহায়া ধরনের, সারাক্ষণই সেজেগুজে আছে।

টিম্বো জায়গাটা খোলামেলা। কাছে পিঠে বনজঙ্গল নেই বললেই চলে, জন্তু জানোয়ারের ভয় কম। তাই এখানে একটু ভালমত বিশ্রাম নেবার আদেশ দিলেন মঁসিয়ে বারজাক। অনেকদিন একটানা চলে সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমরা, লম্বা বিশ্রাম দরকার ছিল। তাঁবু পড়ল। দিন দুই থাকলাম আমরা এখানে।

ডিসেম্বর ১৫। গত দুই দিন ধরেই গাইড মোরিলিরের পাত্তা নেই। কোথায় গেল, কি হলো ভাবনায় ছিলাম আমরা। কিন্তু এদিন ঘুম থেকে উঠেই মোরিলিরের হাঁকডাক শুনলাম, কুলিদের তাড়া লাগাচ্ছে, জলদি করার জন্যে।

জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারলাম না, 'কোথায় গিয়েছিলে, মোরিলিরে?'

চোখ তুলে চাইল মোরিলিরে। তারপর চোখ নামিয়ে আমতা আমতা করে বলল, 'না, এই তো, মানে কোথাও না।'

বুঝলাম, খামোকা কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, বলবে না মোরিলিরে। ভাবলাম, পুরানো কোন স্যাঙ্গাত আছে তার এই গ্রামে, সম্ভবত ওর বাড়িতেই দুটো দিন অতিথি হয়ে কাটিয়েছে।

টিম্বোর পর থেকেই কিন্তু রাস্তা খারাপ হতে আরম্ভ করল। প্রায়ই চড়াই উৎরাই ভাঙতে হচ্ছে। বুঝলাম, আসল অভিযান শুরু হলো এবার; একদিনেই পাহাড় পেরোতে হলো গোটা তিনেক। সন্ধে ছ'টা নাগাদ অসম্ভব ক্লান্ত হয়ে দাউহেরিকো গ্রামে পৌঁছুলাম। যথেষ্ট খাতির যত্ন করল মোড়ল।

বারজাক মহাখুশি। বদ্রিয়ার্সকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, 'আরে বাবা, লোকের সঙ্গে না মিশলে কি ওদের চেনা যায়? এই যে, যে গাঁয়েই যাচ্ছি, কি খাতির করছে লোকেরা। আমাদের ফ্রান্সবাসীদের অমন অতিথিপরায়ণতার কথা ভাবা যায় না।'

মুখ কুঁচকালেন বদ্রিয়ার্স, জবাব দিলেন না।

গ্রামের সবচেয়ে ভাল কুঁড়েঘরগুলোয় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিল মোড়ল। তার নিজের খড়ের প্রাসাদে থাকতে দিল মিস ব্লেজনকে। আমরা তো হতবাক। অমন অতিথিপরায়ণ এই জঙলী মোড়ল।

কিন্তু বেঁকে বসল মালিক। মিস ব্লেজনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। ফিরে এলে মিস ব্লেজনের মুখে শুনলাম, তাকে মোড়লের ঘরে থাকতে দিতে মালিক একেবারেই নারাজ। এমনকি আমাদেরও গ্রামের লোকের কুঁড়েঘরে থাকতে নিষেধ করছে নাকি মেয়েটা। কারণ কি?

ওদিকে অত খাতিরযত্ন দেখে ক্যাপ্টেন মারসিনেও কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। শেষ পর্যন্ত হুকুম দিয়ে বসলেন, এই গ্রামে আর এক মিনিটও নয়। জলদি গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে। নিশ্চয়ই মালিক সন্দেহজনক কিছু দেখেছে। কিংবা শুনেছে। এই অঞ্চলেরই মেয়ে তো। বিপদ ঠিক বুঝতে পারে।

গ্রাম ছাড়িয়ে মাইল দু'য়েক এসে তারপর তাঁবু ফেলা হলো।

কিন্তু কিছুই বুঝলাম না, কেন অত ভয় পেয়েছে মালিক? ক্যাপ্টেনই বা অত চিন্তিত কেন? তবে সে রাতে না বুঝলেও পরে হাড়ে হাড়ে মালিকের কথার যথার্থতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম।

—আমিদী ফ্লোরেন্স

ছয়

লা এক্সপ্যানসন ফ্রাঁসে পত্রিকায় আমিদী ফ্লোরেন্সের লেখা তৃতীয় অধ্যায় বেরোয় ৫ ফেব্রুয়ারি। এবং সেটাই তাঁর শেষ খবর। এরপর আর লেখা পাঠাননি রিপোর্টার। কারণ রহস্যাবৃত।

বারজাক মিশন

(নিজস্ব সংবাদদাতার খবর)

ডিসেম্বর ২৪। কানকান। গতকাল এসে পৌঁছেছি এখানে। আগামীকালই ছেড়ে যাচ্ছি এ জায়গা। বড়দিন এই দুর্গম এলাকায়ই কাটাতে হচ্ছে। মন কেমন করছে দেশের জন্যে। সেখানে বাইরে নিশ্চয়ই এখন তুষার ঝরছে। ঘরের ভেতরে ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে নিশ্চয়ই হুল্লোড় করছে সবাই, উৎসবের জন্যে তৈরি হচ্ছে।

মনে আছে নিশ্চয়ই, এক নিগ্রো গ্রামে আমাদের রাত কাটাতে বারণ করেছিল মালিক? আশ্চর্য! এরপর থেকে কালোদের কোন গাঁয়েই আর আমাদের রাত কাটাতে দিচ্ছে না সে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ক্যাপ্টেন মারসিনে। গ্রামের লোক দেখলেই তেড়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ বুঝতে পারছি না। কোথায় যেন কি একটা গোলমাল হয়েছে।

মঁসিয়ে বদ্রিয়ার্স মহাখুশি। ওদিকে ক্রমেই খাপ্পা হয়ে উঠছেন মঁসিয়ে বারজাক। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে সেদিন হন হন করে এগিয়ে গিয়ে থামলেন ক্যাপ্টেনের সামনে। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কার হুকুমে গাঁয়ের নিরীহ লোকের সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করছেন আপনি? দলের নেতা কি আপনি?'

'না, মঁসিয়ে, আপনি,' বিনীতভাবে জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন।

'তাহলে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে এ ব্যবহার কেন?'

'আপনার আর সঙ্গের লোকদের নিরাপত্তার জন্যেই।'

'কি করে জানলেন নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে চলেছে?'

'এক মহা ষড়যন্ত্র আঁচ করেছি আমি, কিছু কিছু কথা কানেও এসেছে।'

'মানে? ফরাসী সরকারের অধীন নিরীহ নিগ্রোরা আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে? ভাবলেন কি করে কথাটা?'

'তাই করছে, শুনেছি মালিকের কাছে।'

'আপনার মত একজন ঝানু অফিসার সামান্য একটা বাঁদীর কথায় নাচবেন, জানা ছিল না।' আরও গম্ভীর হলেন বারজাক। 'আপনার কথায় আর চলছি না আমি। আজই গিয়ে গাঁয়ের কারও কুঁড়েতে রাত কাটাব।'

'সেক্ষেত্রে ইচ্ছের বিরুদ্ধেও কর্তব্য করতে হবে আমাকে,' বিনীত ভাবেই বললেন ক্যাপ্টেন। 'আপনাকে বাধা দেব আমি সরাসরি।'

'মানে!' রাগে লাল হয়ে উঠল বারজাকের মুখচোখ।

'তাঁবুতে আটকে রাখব আপনাকে,' বলেই আর কথা না বাড়িয়ে ঘুরে হাঁটতে শুরু করলেন ক্যাপ্টেন।

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মিস ব্লেজন, এগিয়ে এসে বোঝাতে লাগলেন মঁসিয়ে বারজাককে। 'মালিক ঠিকই বলেছে, মঁসিয়ে বারজাক : ডোণ্ডং কোন জিনিসটা কি চেনেন?'

'আমি চিনি,' পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ডক্টর চাতোন্নে। এবার এগিয়ে এসে বললেন, 'এক ধরনের মারাত্মক বিষ। খাবার আটদিন পর শুরু হয় বিষের ক্রিয়া। এবং তখন টের পেলেও আর করার কিছুই থাকে না। জানেন কি করে তৈরি হয় এই

বিষ?'

বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন মঁসিয়ে বারজাক। কিন্তু রাগ কমেনি, তাই কোন উত্তর দিলেন না।

'কি করে?' প্রশ্ন করলেন মিস জেন ব্লেজন।

'মড়ার পেটে জোয়ারের বোঁটা ঢুকিয়ে রাখা হয়; একুশ দিন পর বের করে গুঁড়িয়ে দুধ, পানি বা অন্য কোন তরল পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে শত্রুকে কায়দা করে খাইয়ে দেয় নিগ্রোরা। বিষটা স্বাদ-গন্ধহীন, তাই মোটেই ধরা যায় না। খাবার আট দিনের মাথায় পেট ফুলতে শুরু করে রোগীর। মারা যায় দুই দিন পরেই। কোন চিকিৎসা নেই।' এই বিষ প্রয়োগের একটা রক্ত জমানো কাহিনীও শুনিয়ে দিলেন ডক্টর চাতোন্নে।

'সেদিন রাতে গাঁয়ে গিয়েছিল মালিক,' বললেন মিস ব্লেজন। নিজের কানে শুনেছে, মোড়ল গাঁয়ের আরও কয়েকজনকে নিয়ে যুক্তি করছে, খাতিরযত্ন করে নিজেদের ঘরে নিয়ে গিয়ে দুধের সঙ্গে কায়দা করে এই বিষ খাইয়ে দেবে আমাদের। পরদিন আড়ালে আবডালে থেকে থেকে আমাদের পেছন পেছন যাবে। আটদিন পর আমরা মারা গেলে জিনিসপত্র সব লুট করে নেবে।'

হাঁ করে শুনলেন সব মঁসিয়ে বারজাক। এবারে আর মিস ব্লেজনের কথাকে অবিশ্বাস করতে পারলেন না কিছুতেই। জঙ্গলী নিগ্রোদের আদর আপ্যায়নের ধরনধারণ একটু বেশিই মনে হতে লাগল তাঁর কাছে। সময় বুঝে এগিয়ে এলেন এবার মঁসিয়ে বদ্রিয়ার্স, 'কি, বলিনি? নরপিশাচদের পক্ষে না নাচতে শুরু করেছিলেন? এবার?'

রাগে ফেটে পড়লেন বারজাক, 'হারামজাদাদের গ্রাম সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেব কাল থেকে।'

শুনে আঁতকে উঠলেন মিস ব্লেজন। 'সাবধান, ও কাজটিও করতে যাবেন না। এই অসভ্য এলাকায় হাজার হাজার নিগ্রোর সঙ্গে সামান্য কয়েকজন সৈন্য নিয়ে একেবারে মারা পড়ব আমরা। যত আধুনিক সৈন্যই হোক না কেন।'

'অথচ এই খুনে নরখাদকদের হাতেই রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দিতে চাইছিলেন মঁসিয়ে বারজাক।' ফোঁড়ন কাটলেন বদ্রিয়ার্স।

'এক গাঁয়ের লোক দেখেই কিন্তু সব লোককে বিচার করা যায় না, মঁসিয়ে বদ্রিয়ার্স,' এবারে মঁসিয়ে বারজাকের পক্ষে কথা বললেন মিস ব্লেজন।

আর ঠেকানো গেল না বারজাককে, বক্তৃতা আরম্ভ করে দিলেন, 'ভাইয়েরা, আরেকটা দিক ভাবতে হবে আমাদের। সুসভ্য নাগরিক আমরা, তাছাড়া ফরাসী। চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে কি আমরা ভয় পাই? বিষের ভয়ে কর্তব্য থেকে সরে দাঁড়াব? আমার আগের বক্তা এইমাত্র যা বললেন···।'

বাতাসে জোরে হাত নেড়ে বারজাককে থামিয়ে দিলেন মিস জেন ব্লেজন। 'তর্কবিতর্ক থাক এখন, মঁসিয়ে বারজাক। অভিযান ঠিকই চলবে আমাদের, কিন্তু রক্তপাত এড়িয়ে। ক্যাপ্টেন মারসিনের কথামত চললেই নিরাপত্তা বজায় থাকবে আমাদের।'

'ক্যাপ্টেনের কথামত!' পরিষ্কার বোঝা গেল যে মিস ব্লেজনের কথাটা ঠিক

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

আপনাদের প্রিয় ওয়েবসাইট Banglapdf.net এখন ডোমেইন নেইম পরিবর্তন করে BanglaPdfBoi.Com এ রুপান্তরিত হয়েছে। আপনারা সবাই নিজ নিজ বুকমার্কস পরিবর্তন করে নিবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

পছন্দ হলো না মঁসিয়ে বারজাকের।

'ওঁকে একটু সম্মানের চোখে দেখা উচিত আপনার, মঁসিয়ে বারজাক,' রাগ করেই বললেন মিস ব্লেজন। 'যিনি আপনার জীবন বাঁচালেন তাঁকে অতটা অবহেলা করা ঠিক হচ্ছে না। আমি হলে অনেক আগেই তাঁর কাছে গিয়ে ধন্যবাদটা জানিয়ে আসতাম।'

মিস ব্লেজন রেগে যেতেই নরম হয়ে গেলেন বারজাক। বললেন, 'অ্যাঁ-হ্যাঁ, তা ঠিকই বলেছেন। হঠাৎই মেজাজটা বিগড়ে গিয়েছিল, কিছু মনে করবেন না,' বলে হন হন করে এগিয়ে গিয়ে সোজা ক্যাপ্টেনের হাত চেপে ধরলেন।

'মাপ করবেন, ক্যাপ্টেন...'

'আরে, আরে, সে কি! আমি তো কিছুই মনে করিনি।'

আবার সহজ হয়ে এল পরিস্থিতি এবং হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমরা।

কিন্তু ওদিকে আরেক কাণ্ড। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেন্ট বেরেনকে। নাহ্ কোন তাঁবুতেই নেই।

খোঁজাখুঁজি দেখে হাতের কাজ ফেলে এগিয়ে এল টোনগানে, 'কি হলো? কাকে খুঁজছেন?'

বললাম, 'মঁসিয়ে সেন্ট বেরেন কোথায়, দেখেছ?'

'উনি? উনি তো ওই যে, ওখানে।' আঙুল তুলে একটা দিক দেখিয়ে দিল টোনগানে।

'কোথায়, চলো তো দেখি?'

'চলুন...'

টোনগানের পেছন পেছন শ'খানেক গজ দূরে ঝোপের ওপাশের একটা ডোবার কাছে দাঁড়ালাম। কিন্তু কোথাও চোখে পড়লেন না সেন্ট বেরেন। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে টোনগানের দিকে তাকাতেই আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল সে। দেখলাম, একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে আছেন সেন্ট বেরেন। বড়শিতে ব্যাঙ গাঁথছেন, টোপ। মুখটা মলিন, ব্যাঙের কষ্টে যেন তাঁরও কষ্ট হচ্ছে। হবেই। হাজার হোক বড়শি বেঁধার যন্ত্রণা তো টের পেয়েছেন। এখনও পুরো শুকোয়নি। কিন্তু কি আর করা, খাবার তো জোগাড় করতে হবে—যদিও কেউ তাঁকে খাবার জোগাড়ের জন্যে বলেনি।

ব্যাঙ গেঁথে তিনি কি মাছ ধরবেন? বড় কৌতূহল হলো। তাই তাঁকে না ডেকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে লক্ষ করতে থাকলাম।

বড়শিতে বেঁধা ব্যাঙটাকে কিন্তু পানিতে ফেললেন না বেরেন। ডোবার পানি আর মাটির মাঝখানে ফেলে শক্ত করে ধরে রাখলেন ছিপটা। আরও আশ্চর্য লাগল আমাদের! পাগল হয়ে গেলেন নাকি ভদ্রলোক! পানি থেকে ডাঙায় উঠে এসে টোপ গিলতে তো শুনিনি কোন মাছকে!

কিন্তু না, পাগল হননি বেরেন। বড়জোর মিনিট পনেরো অপেক্ষা করতে হলো। তার পরেই অতি সাবধানে পানি থেকে মাথা তুলল জীবটা। ব্যাঙটার হাত দু'য়েক দূরে। তারপর সন্তর্পণে এগিয়ে আসতে লাগল খাবারের দিকে।

'গুইলেটাপি,' বিদঘুটে জীবটাকে দেখিয়ে ফিসফিস করে বলল টোনগানে।

নিগ্রোদের ভাষায় গুইলেটাপি মানে ইগুয়ানা : এক জাতের গিরগিটি।

যত সাবধানেই উঠে আসুক ব্যাঙটাকে গিলতে কিন্তু বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না ইগুয়ানা। এবং বড়শি বেঁধাল নিজের গলায়। ছিপ ধরে টেনে টেনে ইগুয়ানাটাকে কাছে আনলেন সেন্ট বেরেন। তারপর কাছেই ফেলে রাখা একটা লাঠি তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে পেটাতে লাগলেন জানোয়ারটাকে।

'কাণ্ড দেখুন,' রেগেমেগে বলল টোনগানে, 'জোরে মারলে ব্যথা পাবে গুইলেটাপিটা, তাই আস্তে পেটাচ্ছেন। আরে বাবা ধরতেই যখন পারলি, দে না আচ্ছা করে কষে এক ঘা।'

শেষ পর্যন্ত আর সইতে পারল না টোনগানে। ছুটে গিয়ে সেন্ট বেরেনের হাত থেকে লাঠিটা টান মেরে ছিনিয়ে নিয়েই দমাদম দুই ঘা লাগাল ইগুয়ানাটাকে। জীবটা মরে যেতেই হাসি ফুটল বেরেনের মুখে। স্বস্তির হাসি।

'চমৎকার একটা শিকার করলেন, মঁসিয়ে,' বেরেনকে বলল টোনগানে, 'তোফা' খাওয়া হবে।'

ডিসেম্বর ২৬। তাঁবু তুললাম আমরা। একটা বেশ বড়সড় নদী পড়ল মাইলখানেক যেতে না যেতেই। আমাদের দেখেই ঝপাং ঝপাং করে নদীতে গিয়ে ঝাঁপ দিল গোটা পাঁচছয় জানোয়ার। কুমীর আর জলহস্তী! মুশকিল তো! জলহস্তীকে এড়িয়ে না হয় ওপারে যাওয়া গেল, কিন্তু কুমীর? ওই কুৎসিত হতচ্ছাড়া প্রাণীগুলো তো ছাড়বে না।

কি করা যায় ভাবছি, এমন সময় এগিয়ে এল মোরিলিরে। বলল, 'এখান দিয়ে নদী পেরোনো যাবে না। মাইল চারেক উজানে এক জায়গায় পাথর জমে জমে নদীর গভীরতা বড়জোর দু'ফুটে এসে দাঁড়িয়েছে। ওখান দিয়েই পেরোতে হবে।'

চললাম। কিন্তু উজানে এসেই পানিতে নামতে গিয়ে গোল বাধাল গাধাগুলো। ভাটিতে কুমীর আর জলহস্তী দেখে এসেছে, এখনও ভয় কাটেনি, তাই কিছুতেই নামতে চাইছে না।

অনেক রকম সাধ্যসাধনা করেও কোন কাজ হলো না। একটা গাধাকেও এক পা নামানো গেল না। গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নদীর তীরে।

'বুঝেছি,' ইয়া মোটা এক লাঠি হাতে এগিয়ে এল টোনগানে, 'গাধা গাধা-ই,' বলেই ধুমসে পেটাতে শুরু করল সামনের তিনটে গাধাকে। উপায়ান্তর না দেখে বিকট স্বরে প্রতিবাদ জানাতে জানাতে পানিতে পা দিল গর্দভ প্রবরেরা। বোধ হয় বুঝল যে কুমীরের চাইতে টোনগানের হাতের লাঠি বেশি নির্দয়।

জানোয়ারগুলোকে লাঠিপেটা করাটা পছন্দ হলো না বেরেনের। ছুটে এসে প্রতিবাদ করতে করতে বললেন, 'আহা-হা অত মারছ কেন জানোয়ারগুলোকে, টোনগানে। বললেই হত, একটা বড়শি ধার দিতাম, সামনের গাধাটার পাছায় সামান্য একটু ফুটিয়ে দিলেই হত।'

কথা শুনে হাসি চেপে রাখা দায় হলো।

গাধা তো নামল, কিন্তু আরেক বিপদ হলো। ভয়ের চোটে দ্রুত নদী পেরোতে লাগল গাধাগুলো, ফলে পিঠের বোঝা সব পানিতে ভেসে যাবার জোগাড় হলো। ওদিকে আগে ভাগেই ঘোড়ায় চেপে নদী পেরিয়ে এসে সমানে চেঁচাতে লাগলেন

মঁসিয়ে বারজাক। মালপত্র সব পানিতে ভেসে গেলে অভিযানই যে পণ্ড হয়ে যাবে।

কিন্তু মোরিলিরে থামাল তাঁকে। 'ভাববেন না, মঁসিয়ে, এখুনি সব ঠিক করে ফেলবে কুলিরা।'

হলোও তাই, একটা বোঝাও নষ্ট হতে দিল না কুলিরা।

আবার পথ চলা।

একসময় পাহাড় ডিঙিয়ে টিনকিসো উপত্যকায় পৌঁছলাম। একটা ব্যাপার চোখে পড়ছে কিন্তু সেই দাউহেরিকো থেকেই। টোনগানেকে ছেড়ে মোরিলিরের সঙ্গে খুব দোস্তি পাতিয়েছে চৌমৌকি। সারাক্ষণ পাশাপাশি চলছে। আর ওদিকে মালিকের সঙ্গে জবর খাতির টোনগানের। সেদিকে তাকিয়ে একবার মুচকে হাসতে দেখলাম মিস ব্রেজনকে।

উপত্যকা পেরোতেই শুরু হলো জঙ্গল। তবে গভীর নয়, গাছপালাও বেশির ভাগই মরা। জমি খটখটে শুকনো, বৃষ্টি নেই বোধহয় দীর্ঘদিন।

দাউহেরিকো ছাড়ার তিনদিন পর আবার একটা মজার ঘটনা ঘটালেন সেন্ট বেরেন। তিনিই দলের প্রাণ, স্বীকার করতেই হচ্ছে।

গাইডের পরামর্শমত মরা জঙ্গল ছাড়াবার পরই আমাদের সব বন্দুক বাক্সে ভরে রাখা হয়েছিল। এই অঞ্চলের নিগ্রোরা নাকি ভয়ানক হিংস্র। বন্দুক দেখলেই ভড়কে গিয়ে মারাত্মক বিষ মাখানো তীর আর বল্লম নিয়ে আক্রমণ করে বসতে পারে।

জঙ্গলের ধারের একটা গ্রামের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎই কোথা থেকে দমাদম ঢিল এসে পড়তে লাগল সেন্ট বেরেনের পিঠে। সেই সঙ্গে বনের ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে এল, 'মারফা! মারফা!' (বন্দুক! বন্দুক!)

কিন্তু কোথায় মারফা? আর বেরেনের ওপরই বা অদৃশ্য শত্রুর এই আক্রোশ কেন?

মোরিলিরে কিন্তু মুচকে হাসল। হাত তুলে বেরেনের পিঠের দিকে নির্দেশ করে বলল, 'ওটাই যত গণ্ডগোলের মূল।'

'কে, মঁসিয়ে বেরেন...' বলতে বলতেই বেরেনের পিঠে ঝোলানো ছিপ রাখার ধাতব খাপটার দিকে চোখ পড়ে গেল। হেসে বললাম, 'আপনার ওই ছিপের খাপটাকে বন্দুক মনে করেছে অসভ্যরা।'

'তবে রে হারামজাদারা,' হঠাৎই খেপে গেলেন সহজ সরল লোকটা। তড়াক করে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমেই বনের দিকে ছুটলেন, 'দেখাচ্ছি মজা। ছিপের খাপ দিয়েই পিটিয়ে লাশ করব আজ।'

অনেক কষ্টে ধরেটরে তাঁকে ফেরানো হলো।

এগিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন মারসিনে। বললেন, 'কপাল ভাল, বন্দুক ভেবে তীর ছুঁড়ে বসেনি অসভ্যরা। আর ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।' টোনগানের দিকে ফিরে আদেশ দিলেন, 'মঁসিয়ে বেরেনের ছিপের খাপও বাক্সে ভরে রাখো।'

'কখখনো না,' রুখে উঠলেন শান্তশিষ্ট বেরেন। 'ওটা আমার পিঠে যেমন আছে, থাকবে।'

অনেক বুঝিয়েও রাজি করানো গেল না বেরেনকে। কিছুতেই পিঠছাড়া করতে রাজি হলেন না তিনি খাপটা। অগত্যা চট দিয়ে মুড়ে দেয়া হলো ওটাকে। যাক, এখন আর বন্দুক বলে ভুল করবে না নিগ্রো ব্যাটারা।

বিভিন্ন রকম গোলমালে বারো ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল কানকান পৌঁছতে। তাঁবু ফেলার হুকুম দিলেন মঁসিয়ে বারজাক।

খাবার সময় দেখা গেল মোরিলিরে নেই। কোথায় গায়েব হয়ে গেছে কে জানে! গ্রামে গিয়ে ঢুকেছে নাকি?

পরদিন ভোরেই কিন্তু কুলিদের ধমকাতে দেখা গেল আবার ওকে। এভাবে তার অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা এবারে আর মোটেই ভাল চোখে দেখলেন না ক্যাপ্টেন মারসিনে। কড়া ধমক লাগালেন। আমতা আমতা করে যেমন তেমন একটা কৈফিয়ত দিল মোরিলিরে। কিন্তু বুঝলাম, ক্যাপ্টেন সেটা মোটেই বিশ্বাস করলেন না।

সকালে চায়ের টেবিলে বসে একটু অদ্ভুত খবর দিলেন মঁসিয়ে বেরেন। ভোর রাতে সবুজ ব্যাঙের চিৎকারে উঠে পড়েছিলেন তিনি। তাঁবু থেকে বেরিয়েই দেখেন, পুবদিক থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে একটা লোক। কাছে আসতেই চিনলেন, মোরিলিরে। আমরাও পুবদিকেই যাচ্ছি। রাতের বেলা ওদিকে কি করতে গিয়েছিল মোরিলিরে? ব্যাপারটা বেশ ভাবিয়ে তুলল আমাদের।

আরেকটা ছোট্ট ঘটনা ঘটল এদিনেই। প্রায় জোর করেই সেন্ট বেরেন, বারজাক, চৌমৌকি, মিস ব্লেজন আর আমাকে কানকানের এক ওঝার ভেল্কিবাজি দেখাতে নিয়ে গেল সে। হাত সাফাইতে নাকি লোকটা ওস্তাদ। কৌতূহল হলো, তাই গেলাম।

গ্রামে ঢুকে অতি নোংরা এক কুঁড়েঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মোরিলিরে ডাকতেই বিচিত্র পোশাক (জানোয়ারের ছাল, পাখির পালক, চিতার দাঁত ইত্যাদি) পরা এক ভয়ঙ্করদর্শন লোক এসে দাঁড়াল কুঁড়েঘরের দরজায়। আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল ঘরের ভেতরে, একটা মাদুরের ওপর বসতে দিয়ে জিজ্ঞেস করল কি জন্যে এসেছি।

কারণটা জানাল মোরিলিরেই।

লোকটা তখন তন্ত্রমন্ত্রের অদ্ভুত সব জিনিসপত্র খুলে বসল। গম্ভীর গলায় মন্ত্র উচ্চারণ করল কিছুক্ষণ। তারপর একে একে বলে গেল:

আমাকে: 'তোমার পাঠানো খবর আর কেউ পাবে না।'

সেন্ট বেরেনকে: 'ঘায়ে কিছুদিন কষ্ট পাবে। বসতে অসুবিধে হবে।'

মিস জেন ব্লেজনকে: 'মনের মানুষ ছেড়ে যাবে। মনে বড় কষ্ট পাবে তুমি।'

সব শেষে বারজাককে: 'সিকাসো পেরোলেই সাদা চামড়ার দেখা পাবে। হয় গোলামি, না হয় মৃত্যু।'

দুশ্চিন্তা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম সবাই। আমি যে খবর পাঠাই, জানল কি করে অসভ্য ওঝা? মঁসিয়ে বেরেনের পাছায় ঘা, এটাই বা জানল কি করে? মিস ব্লেজনের মনের মানুষ আর সিকাসোর ওদিকের সাদা মানুষের কথা ছেড়ে দিলাম, কারণ সে সম্পর্কে এখনও আমরা জানি না কিছু।

অন্যদের কথা জানি না, কিন্তু ছোট্ট ঘটনাগুলো কাঁটার মত খচ খচ করে বিঁধতে লাগল আমার মনে। হয়তো কিছুই না, কিন্তু কিছুতেই দূর করতে পারছি না চিন্তাটা। কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল আছে। একটা নগণ্য মোড়লের সাহস হলো কি করে অতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটা দলকে বিষ খাইয়ে মারার? তাকে মদদ জোগানোর মত অতি শক্তিশালী কেউ উস্কানি দেয়নি তো আড়াল থেকে? পর পর দুই বার রহস্যজনক ভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল কেন মোরিলিরে? কোথায় গিয়েছিল? সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারছে না কেন সে ক্যাপ্টেনের প্রশ্নের? অসভ্য ওঝার কি সত্যি দিব্যদৃষ্টি আছে? নাকি আগেই কেউ তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিল?

সব কিছু গভীরভাবে বিবেচনা করলে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, যে আমাদের এই অভিযান তণ্ডুল করে দিতে চাইছে কেউ।

কিন্তু কেন? কে?

ডিসেম্বর ২৬। কানকান ছেড়েছি। সারাদিন চলে বিশ মাইল পথ পেরিয়ে একটা খোলা জায়গায় তাঁবু ফেলা হয়েছে আমাদের। কাছেপিঠে জনবসতি নেই।

বারো মাইল পেছনে ফেলে এসেছি দিয়ানগানা গ্রাম, সামনে তিরিশ মাইল দূরে সিকোরো।

সারাদিন পরিশ্রম গেছে খুব। সকাল সকাল খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। মাঝরাতে অদ্ভুত একটা আওয়াজে চমকে জেগে উঠলাম। পশ্চিম দিক থেকে আসছে শব্দটা। ক্ষীণ থেকে আস্তে আস্তে তীব্রতর হচ্ছে শব্দটা। অনুমান করলাম, শব্দ সৃষ্টিকারী উড়ে আসছে। শুনেছি, আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে কোটি কোটি মৌমাছি এক সাথে উড়ে যাবার সময় অমন আওয়াজ হয়। কিন্তু সে তো দিনের বেলা, এই রাতে কেন?

তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম, আমার আগেই অন্য সবাই বেরিয়ে এসেছে।

আকাশ মেঘে ঢাকা। উপরের দিকে তাকিয়েও কিছুই দেখলাম না।

ক্রমেই মাথার ওপর এসে গেল সেই অদ্ভুত শব্দ। প্রচণ্ড গর্জনে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। কানে আঙুল ঢোকাচ্ছে সবাই।

আতঙ্কে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে নিগ্রো কুলির দল। আমরা হতবাক হয়ে ক্যাপ্টেন মারসিনেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি, ভয় যে পাইনি এমন কথা বলব না।

এই সময়ে মোরিলিরেকে কোথাও দেখলাম না। সে কি ভয়ে তাঁবু থেকেই বেরোয়নি?

পুব থেকে এসে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে পশ্চিমে চলে গিয়েছিল শব্দ। আবার ফিরে এল; এবার পশ্চিম থেকে এসে পুবে চলে গেল।

এভাবে পর পর চার পাঁচবার এল-গেল। নিঝুম নিশুতি রাতের নীরবতা খান খান হয়ে ভেঙে গেল সেই প্রচণ্ড শব্দে।

এরপর সারাটা রাত আমরা কেউ দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। আফ্রিকায় অনেক অদ্ভুত কাণ্ডই ঘটে বলে অভিযাত্রীরা বলেন। কিন্তু এমন ঘটনার কথা কেউ বলেননি।

ভোর হলো। আবার রওনা দেবার পালা। কিন্তু কিছুতেই যেতে চাইল না আর কুলিরা। ভয়ঙ্কর প্রেত যে পুবেই গেছে। হুঁশিয়ার করে দিয়ে গেছে রাতের বেলা। এখন তাঁর কথা অমান্য করে এগোলে সোজা ধরে ধরে ঘাড় মটকাবে। রক্ত নাকি খুব পছন্দ এই প্রেতের।

শেষ পর্যন্ত অনেক রকমে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজি করানো গেল কুলিদের। সবার আগে আগে ঘোড়ার পিঠে চড়লেন ক্যাপ্টেন মারসিনে। মাইল পাঁচেক পুবে এসে হঠাৎ কি দেখে থেমে পড়লেন তিনি। লাফ দিয়ে নামলেন ঘোড়া থেকে। মাটিতে ঝুঁকে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে কি দেখতে লাগলেন।

ব্যাপার কি? একে একে আমরাও নেমে পড়লাম ঘোড়ার পিঠ থেকে, এগিয়ে গেলাম।

অদ্ভুত দাগগুলো আমরাও দেখতে পেলাম। মাটিতে জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে দশটা গভীর দাগ। যেন জোড়া লাঙল টেনে নিয়ে গেছে মাটির ওপর দিয়ে। কঠিন মাটির বুক চিরে ফালা ফালা হয়ে গেছে।

এ কি কাণ্ড! কোন্ রহস্য শুরু হলো আবার?

গত রাতে শুনেছি অদ্ভুত শব্দ! এখন দেখছি অদ্ভুত দাগ! কোন্ ভয়ঙ্কর বিপদের দিকে এগিয়ে চলেছি আল্লাহই জানেন।

—আমিদী ফ্লোরেন্স

সাত

(জানুয়ারি ১২। সমুদ্র উপকূল থেকে বারোশো মাইল দূরে সিকাসোতে এসে পৌঁছেছে বারজাক মিশন। চৌমৌকির হাত দিয়ে খবর ঠিকই পাঠিয়েছেন কিন্তু পত্রিকা অফিসে আর পৌঁছাচ্ছে না আমিদী ফ্লোরেন্সের খবর। এই কথা কিন্তু কিছুই জানতে পারছেন না রিপোর্টার।)

আমিদী ফ্লোরেন্সের নোট বই থেকে:

নিরাপদেই সিকাসো এসে পৌঁছেছি। নতুন আর কোন ঘটনা ঘটেনি পথে।

সিকাসোতে তো এসে পৌঁছলাম। কিন্তু নিগ্রো ওঝার কথা সত্যি তো হলো না। এখন বুঝতে পারছি, আসলে খামোকাই ভেবেছি আমি।

আস্তে আস্তে টোনগানের কাছ থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে চৌমৌকি। ওদিকে তার বন্ধুত্ব নিবিড় হচ্ছে মোরিলিরের সঙ্গে।

খানকয়েক মাটির ঘরের সমষ্টি সিকাসো গ্রাম। গ্রামের বাইরে একপাশে চাষাবাদের জমি, অন্যপাশে ফরাসী সৈনিকদের ছাউনি। আমাদের দেখে অত্যন্ত খুশি হলো সৈনিকেরা। হবেই, অনেকদিন পর দেশের লোকের সান্নিধ্য পেয়েছে।

অফিসাররা কার আগে কে মিস জেন ব্লেজনের সঙ্গে পরিচিত হবে তা নিয়ে যেন উঠে পড়ে লেগেছে।

একদিনেই সমস্ত ছাউনির লোকেদের পরিচিত হয়ে গেছেন সেন্ট বেরেন।

মঁসিয়ে বারজাকও পরিচিত হচ্ছেন সবার সঙ্গে।

সমস্ত অফিসারের সঙ্গেই সমানভাবে মিশেছেন মিস ব্লেজন, শুধু এক ক্যাপ্টেন মারসিনে ছাড়া। তাঁর দিকে যেন একটু বেশি পক্ষপাতিত্ব।

এই সিকাসো থেকেই দু'দলে ভাগ হয়ে যাবে বারজাক মিশন। একদল মঁসিয়ে বারজাকের অধীনে যাবে সিধে পুবে, অন্য দল বদ্রিয়ার্সের নেতৃত্বে দক্ষিণে। প্রথম দল নাইজারের দুর্গম অজ্ঞাত অঞ্চল পেরিয়ে পৌছবে দাহোমে। গ্র্যাণ্ড বাজামে যাবে দ্বিতীয় দল।

বারজাকের দলে থাকব আমি, পসিঁ আর ডক্টর চাতোন্নে; বদ্রিয়ার্সের সঙ্গে যাবেন হেইরো, কুইরো আর তাসিন। আমি কিন্তু ইচ্ছে করেই বারজাকের সঙ্গী হলাম। বদ্রিয়ার্সের চাইতে অনেক বেশি পেরোতে হবে তাঁকে। দেখার সুযোগ পাব অনেক, লেখার উপাদান পাব বেশি।

সমান দু'ভাগে ভাগ হয়ে দুই দলের সঙ্গে যাবে সৈন্যেরা। একশো জন ক্যাপ্টেন মারসিনের নেতৃত্বে বারজাকের সঙ্গে, বাকি একশো একজন লেফটেন্যান্টের নেতৃত্বে বদ্রিয়ার্সের সঙ্গে।

এখন কথা হলো মিস জেন ব্লেজন আর তার বোনপো যাবেন কার সঙ্গে? নিজেই যেচে মত দিলেন মিস, মসিয়ে বারজাকের দলের সঙ্গ নেবেন তিনি। আড়চোখে লক্ষ করলাম, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ক্যাপ্টেন মারসিনের মুখ।

কিন্তু পরক্ষণেই মিস ব্লেজনের কথা শুনে মুখ শুকিয়ে গেল তাঁর। আমরাও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম।

আমাদের সঙ্গে হোমবোরি পেরিয়ে নাইজার বাঁকের গাঁও অঞ্চলে যাবার পরই সেন্ট বেরেন আর তাঁর কুলি-গাইডদের নিয়ে উত্তরে চলে যাবেন মিস ব্লেজন। ওই অঞ্চলে আজ পর্যন্ত এমন কি ফরাসী সৈন্যেরা পর্যন্ত পা দেয়নি, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা। কি আছে সেখানে কেউ জানে না। শোনা যায়, ওদিকেই নাকি অতি ভয়ঙ্কর, দুর্ধর্ষ তোয়ারেগ উপজাতির বাস; ডাকাতিই ওদের পেশা।

মিস ব্লেজনকে বাধা দিয়েও কোন লাভ হবে না, জানি আমরা। ওখানে যাবেন বলেই তিনি ইউরোপ ছেড়েছেন।

ওদিকে কিন্তু গোল বাধাল মোরিলিরে। মঁসিয়ে বারজাকের সঙ্গে কিছুতেই যেতে চাইল না সে। তার ইচ্ছে মঁসিয়ে বদ্রিয়ার্সের সঙ্গে যায়। এর ওপর আবার আরেক সমস্যা। কুলিদের সঙ্গে শর্ত ছিল যে তারা সিকাসো পর্যন্ত আসবে, তাই এসেছে ওরা; এখন আর এক পা-ও সামনে এগোবে না।

কুলিরা যখন কিছুতেই রাজি হলো না তখন নতুন গাইড আর কুলির সন্ধানে গ্রামে গেলেন ক্যাপ্টেন মারসিনে। কপাল ভাল আমাদের, একজন দক্ষ গাইড পাওয়া গেল। তবে টাকা বেশি—তা হোক। পয়সা দিতে কার্পণ্য করবে না বারজাক মিশন। কুলিও পাওয়া গেল।

আশ্চর্য! খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে এসে বারজাকের কাছে প্যানর প্যানর করতে লাগল মোরিলিরে। অন্যায় হয়ে গেছে তার, এখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে, মঁসিয়ে বারজাকের সঙ্গেই যেতে চায় সে। সুর পাল্টাল কুলিরাও, জাহান্নামে নিয়ে গেলেও যাবে ওরা এখন। বোঝা গেল, কুলি ধর্মঘট ঘটিয়েছিল এই

মোরিলিরেই। তাকে এখন আদৌ কাজে রাখা উচিত হবে কিনা ভাবতে লাগলাম আমরা।

শেষ পর্যন্ত অনেক মাফটাফ চেয়ে চাকরি বজায় রাখল মোরিলিরে। অভিজ্ঞ লোক সে, তাই আবার সঙ্গে নিতে অরাজিও হলেন না মঁসিয়ে বারজাক। নতুন গাইড যাবে মঁসিয়ে বদ্রিয়ার্সের সঙ্গে।

জানুয়ারি ২১। আবার নতুন করে যাত্রা শুরু হলো আমাদের। ছাউনির সৈনিকেরা ব্যান্ড-বিউগল বাজিয়ে, নিশান উড়িয়ে, কুচকাওয়াজ করে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিল দুই দলকে।

মোরিলিরের দেখানো পথে আফ্রিকার অতি দুর্গম, অজ্ঞাত অঞ্চলে চললাম আমরা।

আট

(আমিদী ফ্লোরেন্সের নোটবই থেকে।)

জানুয়ারি ২২। সিকাসো থেকে রওনা দেবার পর থেকেই আবার ওঝার চিন্তাটা মনে এসে ভর করেছে। ধীরে ধীরে যেন ফলতে চলেছে তার কথা। দেখছি, অল্পেতেই কাহিল হয়ে পড়ছে কুলিরা, বার বার জিরিয়ে নিতে চাইছে। চলার কোন উদ্যমই যেন আর নেই ওদের মধ্যে।

জানুয়ারি ২৩। চলার গতি অতি ধীর আমাদের। পথের অবস্থা খুবই খারাপ, বেশি চড়াই উৎরাই। মন ভাল যাচ্ছে না কুলিদের।

জানুয়ারি ২৪। আজ সন্ধ্যায় কাফেনে পৌছলাম। চারদিনে তিরিশ মাইল, দিনে মোটে আট মাইল। আশঙ্কাজনক।

জানুয়ারি ৩১। আমাদের চলার গতি আরও ধীর। ছ'দিনে মাত্র তিরিশ মাইল। কোকোরো নামে একটা গ্রামে এসে পৌছেছি।

কোকোরোর পর থেকে শুরু হলো বোবো উপজাতির দেশ। অকল্পনীয় নোংরা আর পেটুক এরা। খায় না এমন কিছু নেই, পোকায় ধরা পচা গোশত পর্যন্ত খায়। এদের মনও নোংরা।

গতকাল রাতে লিখতে পারিনি,একটা গোলমাল হয়েছিল। আজ যখন সময় পেয়েছি, লিখে ফেলি:

ঙগাগা নামে একটা গ্রামে পৌছেছিলাম সন্ধেবেলা। নাম যেমন তেমনি গ্রামের ছিরি। ডাইনে, বাঁয়ে, পেছনে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। সামনে অবশ্য অনেক দূর পর্যন্ত সমভূমি, কিন্তু তাও কাঁটাঝোপে ভরা।

কাছে পৌছতেই গ্রাম ভেঙে তেড়ে এল নিগ্রোরা। শ'আটেকের কম হবে না, হাতে তীর-ধনুক-গদা ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র; প্রমাদ গুণলাম।

ভাবনায় পড়ে গেলেন ক্যাপ্টেন মারসিনে। সৈন্যদের রাইফেল হাতে তৈরি থাকতে আদেশ দিলেন।

ওদিকে আমাদের চেয়ে বেশি ভয় পেয়ে বসল সেন্ট বেরেনের অশ্বপ্রবর। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটোছুটি শুরু করল জানোয়ারটা। পরে বেরেনের মুখেই শুনেছি, ঘোড়াটার কোন দোষ ছিল না। জঙলীদের দেখে এর আগের বারে ঢিল খাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে যায় বেরেনের। তাড়াতাড়ি পিঠ থেকে খুলে ছিপের খাপটা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে গেলে ছিপের চোখা মাথার আচমকা গুঁতো লেগে যায় ঘোড়ার পেটে। এতেই ভড়কে যায় ঘোড়াটা।

ঘোড়াটাকে সামলাবার অনেক চেষ্টা করলেন বেরেন, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে গিয়ে পড়লেন জঙলীদের মাঝে। আর রক্ত পানি করা হুঙ্কার ছেড়ে বেরেনকে ঘিরে ধরল জঙলীরা। আমরা একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম।

কিন্তু সাহস আছে বলতে হবে মিস ব্লেজনের। ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে জঙলীদের মাঝে গিয়ে ঢুকলেন। ভয়ঙ্কর গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মান্টো! নটে আমি সৌবা!' (খবরদার! আমি ডাইনী!)

বলেই পকেট থেকে টর্চ বের করে জঙলীদের মুখের ওপর ঘুরিয়ে আনলো। জীবনে টর্চ কি জিনিস দেখেনি এই জঙলীরা। আকাশের বিদ্যুৎ জেনের হাতের মুঠোয় দেখে ভড়কে গেল ওরা। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সরে দাঁড়াল। নইলে কোন্ সময় আবার মুখ দিয়ে রক্ত বের করে ছাড়ে সুন্দরী ডাইনী!

ভয়ে ভয়ে হাত জোড় করে মিস ব্লেজনের সামনে এগিয়ে এল জঙলীদের সর্দার পিনতিয়েবা। কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিলেন মিস ব্লেজন। ওদিকে মাটিতে স্থির পড়ে আছেন সেন্ট বেরেন। আচমকা পড়ে ঘাড় মটকে মরেই গেলেন কিনা কে জানে।

অবস্থা বুঝে ধীরেসুস্থে ভিড় ঠেলে বেরেনের কাছে এসে দাঁড়ালেন ডক্টর চাতোন্নে। ঝুঁকে বসে পরীক্ষা করে দেখলেন।

চোখা একটা পাথর বিশ্রীভাবে বিঁধে গেছে সেন্ট বেরেনের পাছার সামান্য উপরে, বড়শির ক্ষতগুলোর কাছে। প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। চমকে উঠলাম। ওঝার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হলো না তো! হঠাৎই খেয়াল হলো, আমার খবরগুলো জায়গামত পৌঁছেছে তো? অজানা আশঙ্কায় ভরে গেল মন।

দ্রুত হাত চালালেন ডক্টর। বেরেনের ক্ষতস্থান সেলাই করে ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন। অবাক চোখে ব্যাপারটা দেখল জঙলীরা।

ওদিকে সর্দার কিন্তু তাকিয়ে আছে বেরেনের ছিপের খাপের দিকে। চকচকে খাপটা দেখে লোভ সামলাতে পারল না সে। শেষ পর্যন্ত মিস ব্লেজনের দিকে চেয়ে আবদারই করে বসল, জিনিসটা তার চাই।

ব্যথায় কোকাচ্ছিলেন, কিন্তু বেঁকে বসলেন সেন্ট বেরেন। যায় যাবে জান, কিন্তু অত শখের খাপ কিছুতেই হাতছাড়া করবেন না তিনি।

সামান্য একটা ছিপের খাপের জন্যে অতগুলো লোকের জীবন সংশয় দেখা দেবে, কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না মিস ব্লেজন। খাপটা দিয়ে দেবার জন্যে অনেক বোঝালেন বেরেনকে। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে রাজি করানো গেল না। রেগে গেলেন মিস ব্লেজন, কড়া ধমক দিলেন, 'এজনর!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, এই নে কাফ্রী ভূত!' বলে ছিপের খাপটা পিনতিয়েবার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন সেন্ট বেরেন।

ছোঁ মেরে খাপটা নিয়ে নিল পিনতিয়েবা। খুশির চোটে নিজের গ্রামে নিমন্ত্রণই করে বসল অভিযাত্রীদের।

নিমন্ত্রণ রাখতে নয়, দেখার জন্যে গিয়ে ঢুকলাম আমরা গ্রামের ভেতরে। নোংরা, দুর্গন্ধে টেকা দায়। ওয়াক থু করে বমিই করে ফেললেন সেন্ট বেরেন। গ্রামের ঠিক মাঝখানে এক উঠানে জঞ্জালের পাহাড়। যেন অতি যত্নে টিকিয়ে রেখেছে জঙলীরা। এর আশেপাশেই চরছে গবাদিপশু, হতচ্ছাড়ারা আবার পশুও পালে, নিজেরাই তো একেকটা পশু। উঠানের চারপাশে পায়রার খুপরীর মত সারি সারি কুঁড়েঘর। ভেতরে ঢোকার প্রশ্নই ওঠে না, এত দুর্গন্ধ আর নোংরা।

পিনতিয়েবার ঘরের সামনে গিয়ে থামলাম আমরা। আমাদের বসতে বলল সর্দার। মাটিতেই বসে পড়লাম। কিছু উপহারও দিলাম তাকে। উপহার মানে কয়েক টুকরো ছেঁড়াকাপড়, অকেজো তালা, ভাঙা চকমকি পিস্তল, সুঁইসুতো ইত্যাদি। এই পেয়েই বর্তে গেল পিনতিয়েবা। তিড়িং তিড়িং লাফাতে লাফাতে নাচ শুরু করার হুকুম দিল।

বেজে উঠল হরিণের শিং-এ তৈরি 'বোদোতো' বাঁশী। ফাঁপা গাছের গুঁড়িতে তৈরি বিশাল ঢাকে ঘা পড়ল কাঠের গদার। দি-দ্দিড়িম! দি-দ্দিড়িম! দি-দ্দিড়িম!

বিচিত্র পোশাক আর রঙচঙ মেখে নাচতে নাচতে এগিয়ে এল নাচিয়েরা। যার যেভাবে খুশি লাফাচ্ছে, ইচ্ছে হলেই সামনের জনের গায়ে পেছনের জন কিলঘুসি মারছে, ফিরে দাঁড়িয়ে সামনের লোকটাও পাল্টা প্রতিশোধ নিচ্ছে, এই হলো নাচ। কিন্তু এই নাচই তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল জঙলীরা। মাঝে মাঝে 'ইয়া হো, ইয়া হো' বলে বিকট স্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে বাহবা দিতে লাগল সর্দার।

একে একে নাচের দলে গিয়ে যোগ দিল ছেলে বুড়ো-মেয়েরা। টলতে টলতে সর্দারও উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে গদা একটা দিয়ে যাকে খুশি বেদম পেটাতে আর লাফাতে লাগল। হেসে গড়িয়ে পড়ল জঙলীরা। মার খাওয়া লোককেও জোর করে মুখের হাসি ঠিক রাখতে হলো, নইলে পিটিয়ে একদম মেরেই ফেলবে পিনতিয়েবা।

মাঝরাতে থামল নাচ। খাবার তৈরি করার হুকুম হলো। আগেই ভেড়া মেরে চামড়া ছিলে রাখা হয়েছিল, আগুনে সেঁকা হতে লাগল এখন ওগুলো। একটু সেঁক লেগেছে কি লাগেনি, অমনি রাক্ষসের মত গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর পিনতিয়েবা। সমানে আধসেঁকা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে পুরতে লাগল। দেখাদেখি এগিয়ে এল দলের অন্যরাও। এই বিশ্রী দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। তাঁবুতে ফিরে এলাম আমরা।

জঙলীদের হৈ-হুল্লোড় চলল সারা রাত ধরে।

ফেব্রুয়ারি ২। ক্ষতস্থানের অসহ্য যন্ত্রণায় ককাচ্ছেন সেন্ট বেরেন। ঘোড়ার পিঠে বসা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কাজেই এখনও কোকোরাতেই রয়েছি আমরা।

ফেব্রুয়ারি ৩। আজও থেকে গেলাম কোকোরাতে।

ফেব্রুয়ারি ৪। আর থাকা নয়। যেভাবে হোক যেতেই হবে। ভোর ছ'টায়ই

রওনা দিলাম। কিন্তু সন্ধেবেলায় আবার আমরা সেই আগের জায়গায়ই ফিরে এলাম।

পিনতিয়েবা দলবল নিয়ে আমাদেরকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকেই শয়তানি শুরু করল কুলিরা। ইচ্ছে করেই ঘন ঘন থামতে লাগল। গাধার পিঠ থেকে খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে বস্তাগুলো সব। দশটা নাগাদ থামতে আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন মারসিনে। বুঝলেন সবই, কিন্তু ধৈর্য ধরে দেখে গেলেন।

দুপুরের খাওয়া সেরে রওনা দিয়ে বড়জোর আধমাইল গিয়েছি, হঠাৎ থেমে পড়ল মোরিলিরে। কি ব্যাপার? ভুল পথে নাকি এসে পড়েছে। বাধ্য হয়েই আবার পিনতিয়েবার গ্রামে ফিরে আসতে হলো। পরদিন সকালে আবার ঠিক পথে রওনা হব। আশ্চর্য! সকালে কুলিরা চার ঘণ্টায় যেটুকু পথ অতিক্রম করেছিল, এখন মাত্র এক ঘণ্টায় সে পথ পাড়ি দিল।

ফেব্রুয়ারি ৫। রওনা দেবার আগে ক্যাপ্টেনের সামনে এসে হাজির মোরিলিরে। কি ব্যাপার? জিভ কেটে বলল সে, 'ভুল করে ফেলেছি, মঁসিয়ে। গতকাল আসলে ঠিকই এগোচ্ছিলাম, চৌমৌকিও তাই বলছে। সারাটা রাত এ নিয়ে ভেবেছি তো।'

কি আর করা। পথ যখন চিনি না, ওর নির্দেশিত পথেই চলতে হবে। রওনা হলাম। আজও এগিয়ে দিল পিনতিয়েবা আর তার দলবল। নষ্টামি করেই চলল কুলিরা।

অতি ধীরে এগোচ্ছি আমরা।

মারাত্মক ঘটনাটা ঘটল দুপুর নাগাদ। হঠাৎ ঢলে পড়ে মরে গেল একটা গাধা। আঁতকে উঠলাম আমরা। বিষ?

বিকেলের দিকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল একজন কুলি।

সন্ধের পর আবার আরেক ঘটনা। মদ খেয়ে বেঁহুশ হলো কয়েকজন কুলি। আমাদের দীর্ঘ পথযাত্রায় কুলিদের মদ খাওয়ার ঘটনা এই প্রথম। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মদ এদের সরবরাহ করল কে?

কিন্তু শাসন করা যাচ্ছে না। এই গহন অঞ্চলে ওরা বেঁকে বসলেই তো গেছি।

তাঁবুতে মীটিং ডাকলেন ক্যাপ্টেন মারসিনে। মীটিংয়ে থাকলাম শুধু আমি, মিস ব্লেজন, সেন্ট বেরেন, ডক্টর চাতোন্নে আর মঁসিয়ে বারজাক।

কিন্তু কোন সিদ্ধান্তই নেয়া গেল না কুলিদের বিরুদ্ধে। অগত্যা ওদেরকে নিজস্ব পথে চলতে দিতেই হলো।

কিন্তু একটা ব্যাপার নিশ্চিত হলেন মঁসিয়ে বারজাক। এই হতচ্ছাড়াদের হাতে ভোটাধিকার দেয়ার কোন মানেই হয় না।

সুতরাং ফিরে যাওয়া যায় এখন। কিন্তু তাও যে পারব কে জানে? সেক্ষেত্রেও তো কুলিদের ওপরই নির্ভর করতে হবে।

যা থাকে কপালে, এগিয়ে যাওয়াই স্থির হলো।

ফেব্রুয়ারি ৬। গতরাতে পালা করে পাহারা দিয়েছি আমরা। সৈন্যদের দিয়ে পাহারার ব্যবস্থা করতে পারতাম, কিন্তু তাতে ভড়কে যেত ওরা। হয়তো কুলিদের ধরে পিটুনীই দিয়ে বসত। তাতে ফল হত উল্টো। এই দুর্গম অঞ্চলে বেঘোরে প্রাণ

হারাতাম সবাই।

সকালে রওনা দিতে দেরি হয়ে গেল। এদিনও আবার সেই ঢিমে তেতলা চলা।

সন্ধেয় থেমে তাঁবু ফেলা হলো। আজও গতরাতের মতই পালা করে পাহারা দেব আমরা। অভিযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ রকম পাহারা দিয়ে যাব, এই-ই স্থির হয়েছে মীটিংয়ে।

আমার পালা আসতেই আমাকে তুলে দিয়ে শুতে গেলেন ক্যাপ্টেন। তাঁবুগুলোর চারপাশে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতে লাগলাম। হালকা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ায় অদ্ভুত ঘোলাটে আলো ছড়াচ্ছে চাঁদ। খোলা জায়গায়ই চিত হয়ে পড়ে আছে মোরিলিরে। মুখ ছাড়া বাকি শরীর চাদরে ঢাকা। কিন্তু টুপি ঢাকা দিয়ে রাখায় দেখতে পেলাম না মুখও।

হঠাৎই শুনলাম শব্দটা। চিনতে এতটুকু ভুল হলো না; কানকানে এই আওয়াজই শুনেছিলাম। তাড়াতাড়ি হাতঘড়ি দেখলাম, রাত দেড়টা।

পুবদিক থেকে আসছে শব্দটা। মাথার ওপর দিয়ে না এসে দূর দিয়ে মিলিয়ে গেল দক্ষিণে। আর ফিরে এল না।

সোয়া দুটোয় সেন্ট বেরেনকে তুলে দিয়ে আবার ঘুমাতে গেলাম। কিন্তু ঘুম এল না। কেবলই ঘুরে ফিরে মনে আসতে লাগল রহস্যজনক শব্দটার কথা। শেষ পর্যন্ত 'দুত্তোরি ছাই' বলে আবার বেরিয়ে এলাম তাঁবুর বাইরে।

মিনিটখানেক পরেই কানে ভেসে এল আবার সেই শব্দ। দক্ষিণ দিক থেকে এসে পুবে মিলিয়ে গেল আওয়াজটা। গা ছমছম করে উঠল আমার! এ কি রহস্য?

আশেপাশে খুঁজলাম সেন্ট বেরেনকে। কিন্তু কোথাও দেখলাম না। আগেরই মত একভাবে পড়ে ঘুমাচ্ছে মোরিলিরে। বেরেনের তাঁবুতে গিয়েও তাঁকে পেলাম না। কোথায় গেলেন লোকটি? কাছেই নদী, ওখানে মাছ ধরছেন না তো?

গিয়ে দেখলাম, আমার অনুমানই ঠিক। মাছ ধরছেন। তবে তীরে বসে নয়। নদীর মাঝখানে—ভেলাতে। কি আশ্চর্য! ওই ভেলা আবার বানালেন কখন? পরে শুনেছি, সন্ধেয় আমরা যখন তাঁবু খাটাতে ব্যস্ত ছিলাম, লুকিয়ে গিয়ে তখন শুকনো কাঠ বেঁধে বেঁধে ভেলা বানিয়েছেন বেরেন।

ডাকলাম, 'মঁসিয়ে বেরেন?'

'কে? ও মঁসিয়ে ফ্লোরেন্স?'

'হ্যাঁ, কি করছেন?'

'মাছ। মাছ ধরছি।'

'কিন্তু মাঝ নদীতে কেন?'

'বিকেলে মাঝ নদীতেই মাছ ঘাই মারতে দেখেছিলাম।'

'কিন্তু আপনাকে তো পাহারা দিতে বলেছিলাম।'

'পাহারা আর কাকে দেব। সব তো আমাদেরই লোক।'

বুঝলাম, ওই লোকটাকে বোঝানো আমার কাজ নয়। তবু একটু চড়া গলায়ই ডাকলাম, 'এই অত রাতে মাঝ নদীতে ভেলায় বসে থাকা নিরাপদ নয়। কুমীর আছে। জলদি ফিরে আসুন।'

কুমীরের ভয় দেখাতেই তাড়াতাড়ি লগি ঠেলে ফিরে এলেন সেন্ট বেরেন।

তাঁবুর কাছে ফিরে এলাম দু'জনে।

হঠাৎ নদীর দিক থেকে কার আর্তচিৎকার ভেসে এল। আবার ছুটলাম। ছুটতে গিয়ে কোমরে দারুণ ব্যথা পাচ্ছিলেন বেরেন, কিন্তু তবু হাঁচড়ে-পাঁচড়ে এলেন আমার পিছু পিছু। দেখি, তীরের কাছেই পানিতে পড়ে চেঁচাচ্ছে একটা লোক। উঠতে চেষ্টা করছে, কিন্তু বার বারই কিসের টানে তলিয়ে যাচ্ছে।

আরও এগিয়ে দেখলাম লোকটা মোরিলিরে। আমাদের দেখেই ককিয়ে কেঁদে উঠল, 'দোহাই, মঁসিয়ে, বাঁচান! কুমীরে ধরেছে!'

'অত রাতে নদীতে নেমেছিলি কেন, হতভাগা? কুমীরে তো ধরবেই।' ধমকে উঠলেন বেরেন।

একেবারে হাঁটু পানিতে নেমে গেলাম আমি। হাত বাড়িয়ে মোরিলিরের বাড়ানো হাতটা চেপে ধরলাম। টানাটানির চোটে ভুস করে পানির ওপর ভেসে উঠল কুমীরটা। মোরিলিরের একটা পা কামড়ে ধরে রেখেছে। সেন্ট বেরেন লোকটা সহজ সরল হলেও করিৎকর্মা। তীরের কাছে পড়ে থাকা কয়েকটা বড় বড় পাথর দ্রুত তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন কুমীরের মাথায়। বেয়াড়া আক্রমণে ভড়কে গিয়ে মোরিলিরের পা ছেড়ে দিল জানোয়ারটা; হ্যাঁচকা টানে তাকে তীরে তুলে আনলাম আমি।

অবাক লাগল! এই মাত্র তো মোরিলিরেকে পড়ে ঘুমাতে দেখলাম। সে যখন কুমীরের খপ্পরে পড়ে চিৎকার করছিল তখনও তো চাদর গায়ে দিয়ে···। হঠাৎই কথাটা মনে পড়ে যেতে চমকে উঠলাম। মোরিলিরেকে চেপে ধরে টানতে টানতে ছুটলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য! এখনও তো শুয়ে আছে মোরিলিরে!

এগিয়ে গিয়ে টান মেরে চাদরটা পড়ে থাকা মূর্তির গা থেকে সরিয়ে দিতেই ফাঁকিটা ধরতে পারলাম। গাছ আর পাথর দিয়ে মানুষের কাঠামোর মত বানিয়ে তার ওপর চাদর ঢাকা দিয়ে রেখেছে মোরিলিরে। একটা প্রমাণ সাইজের পাথর মাথার কাছে রেখে তার ওপর কায়দা করে নিজের টুপিটা ফেলে রেখেছে। কাছে দিয়ে গিয়েও চালাকিটা ধরতে পারিনি আমি।

রেগে গেলেন সেন্ট বেরেন। প্রচণ্ড এক চড় কষালেন মোরিলিরের গালে। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় গিয়েছিলি, বল্ হারামজাদা!' তারপরই বিশ্বাসঘাতক গাইডের হাতের দিকে চোখ পড়তেই দেখলেন, হাতের মুঠোয় কি যেন লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে মোরিলিরে। ছোঁ মারলেন সেন্ট বেরেন। কিন্তু হাত থেকে কেড়ে নেবার আগেই জিনিসটা সোজা মুখে পুরে দিল মোরিলিরে। একটা কাগজের টুকরো।

আবার থাবা মারলেন সেন্ট বেরেন। খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে চলে এল তাঁর হাতে, কিন্তু বেশির ভাগটাই থেকে গেল মোরিলিরের মুখে। কোঁৎ করে কাগজটা গিলে ফেলল সে।

এত কিছুর পর আর মোরিলিরেকে মুক্ত রাখার ঝুঁকি নিতে চাইলাম না। আমার তাঁবুতে এনে দড়ি দিয়ে আচ্ছা করে ওর হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে সেন্ট বেরেনকে নিয়ে ক্যাপ্টেন মারসিনের তাঁবুতে চললাম। আমাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সেই ভাষা পড়তে পারেন।

লণ্ঠনের আলোয় কাগজটা দেখলেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু লম্বালম্বিভাবে ছিঁড়ে যাওয়া কাগজটায় লেখা টুকরো টুকরো শব্দের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলেন না। মোরিলিরের মুখ থেকে কথা আদায় করে নিলে কাজটা সহজ হবে। আমার তাঁবুতে নিয়ে চললাম ক্যাপ্টেনকে। সেন্ট বেরেনও সঙ্গে চললেন।

কিন্তু তাঁবুতে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালাম। কাটা দড়ির টুকরোগুলো শুধু ছড়িয়ে পড়ে আছে মেঝেতে, মোরিলিরে নেই!

নয়

(আমিদী ফ্লোরেন্সের নোটবই থেকে।)

পাহারাদারদের জিজ্ঞেস করেও কোন হদিস পাওয়া গেল না। মোরিলিরেকে কেউ পালাতে দেখেনি। নাকি মিছে কথা বলছে ওরা, কে জানে!

সাংঘাতিক রেগে গেলেন ক্যাপ্টেন। এই সময় পাহারারত চারজনেরই কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। তারপর কাগজের টুকরোটা নিয়ে নিজের তাঁবুতে চলে গেলেন তিনি।

ঘণ্টাখানেক পরেই ডাক পড়ল আমার ক্যাপ্টেনের তাঁবুতে। আমাকে ঢুকতে দেখেই বললেন, 'এই যে, মঁসিয়ে ফ্লোরেন্স, আসুন। লেখাগুলোর অর্থ উদ্ধার করতে পেরেছি।'

এগিয়ে গিয়ে ক্যাপ্টেনের বিছানায়ই বসে পড়লাম। লেখাটার ফরাসী তর্জমা করে রেখেছেন তিনি। আমাকে পড়ে শোনালেন: 'রাজা ইউরোপীয়দের চায় না…ওরা এখনও আসছেই…চিঠি দেখালেই আসবে সৈন্যদল…হুকুম অবশ্য সে দেবে…তামিল করবে…শুরু করেছ। রাজা এখন…'

'নাহ্, মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝলাম না!' হতাশভাবে এদিক ওদিক মাথা দোলালাম।

'বুঝলেন না?' বললেন ক্যাপ্টেন, 'বুঝিয়ে দিচ্ছি। কোথাও কোন এক রাজা আমাদের এগোতে দিতে চান না। তাঁর কাছে আমরা অযাচিত এক উৎপাত। কোন একটা ষড়যন্ত্র চলছে তাই আমাদের বিরুদ্ধে, রাজারই হুকুমে। যে করেই হোক আমাদের নিরস্ত করতে চান তিনি। দরকার হলে তাঁর হুকুমে সৈন্যদল আসবে।'

রাতেই আবার মীটিং বসল আমাদের। আবার সবার উদ্দেশ্যে কাগজটা পড়ে বুঝিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন।

'হুমম্!' অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে পড়েছেন মঁসিয়ে বারজাক। 'ব্যাপারটা থেকে দুটো জিনিস অনুমান করা যায়। এক, মোরিলিরে সেই রাজার গুপ্তচর। দুই, সাংঘাতিক প্রভাবশালী ওই অজ্ঞাত রাজা। সৈন্যদল পর্যন্ত আছে তাঁর। আমাদের অনেক রকমে ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছেন তিনি। পারেননি। আমরা এগিয়েই চলেছি। এবার সৈন্যদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তিনি।'

ঠিকই বলেছেন মঁসিয়ে বারজাক। একমত হলাম আমরা সবাই।

এখন সবারই প্রশ্ন হলো, আমরা কি আর সামনে এগোব? একগুঁয়ের মত

বললেন বারজাক, 'নিশ্চয়ই এগোব। সামান্য একটা গেঁয়ো রাজার ভয়ে যদি লেজ গুটিয়ে পালাই আমরা, ফরাসীদের ইজ্জত থাকবে?'

কিন্তু তাহলে নতুন আরেকজন গাইড দরকার। তবে আপাতত মিস ব্লেজনের গাইড দু'জন কাজ চালিয়ে নিতে পারবে।

চৌমৌকি লোকটাকে কিন্তু মন থেকে মেনে নিতে পারলাম না আমি। লোকটার হাবভাব কেমন যেন সন্দেহজনক। তাছাড়া মোরিলিরের সঙ্গে সাংঘাতিক ঘনিষ্ঠতা ছিল তার। তবে টোনগানে লোকটা সন্দেহের অতীত, নির্দ্বিধায় বলা চলে এ-কথা।

কুলিদের বোঝাতে গেল দুই গাইড। মোরিলিরে যে ভেগেছে এ-কথা বলল না ওরা কুলিদের। বরং বলল যে, মোরিলিরে রাতের বেলা নদীতে গোসল করতে নেমেছিল, কুমীরে নিয়ে গেছে।

টোনগানে ফিরে এসে বলল যে সব শোনার পর কুলিরা হ্যাঁ বা না কিছুই বলেনি।

ফেব্রুয়ারি ৯। মোরিলিরে নেই, কিন্তু তার প্রভাব রয়ে গেছে কুলিদের মাঝে। আগের মতই ধীর আমাদের গতি। সারাক্ষণই কথা কাটাকাটি করে চলেছে চৌমৌকি আর টোনগানে। মাঝেমধ্যে হাতাহাতির অবস্থা হয়ে যায়। চৌমৌকির ওপর পথ দেখানোর ভার দিলেই সে ভুল পথে নিয়ে যায়। মাইল কয়েক যাবার পর 'ভুল হয়ে গেছে' বলে আবার পিছিয়ে আসে। পক্ষান্তরে টোনগানের পথ নির্দেশ নির্ভুল। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও কিছুই বলা যাচ্ছে না চৌমৌকিকে। কুলিদের সঙ্গে তারই ভাব বেশি, তাকে কিছু বললে বেঁকে বসবে কুলিরা। মহা মুসিবতে পড়েছি।

গত আড়াই দিনে মাত্র বিশ মাইল পথ অতিক্রম করেছি আমরা। এখনও কোকোরো উপত্যকাতেই রয়ে গেছি। তবে ডাইনে-বাঁয়ে পাহাড় আর নেই, ক্রমশ চওড়া হচ্ছে উপত্যকা। পথে নদী কম।

ফেব্রুয়ারি ১১। সকালের দিকে চাষের জমি দেখেই অনুমান করলাম, সামনে গ্রাম। পথের ধারে অসংখ্য উইয়ের ঢিবি দেখলাম। বিশাল ঢিবিগুলো মানুষ প্রমাণ উঁচু। পাখি আর কোন কোন জানোয়ারের মত এই উই কিন্তু জঙলীদেরও অতি প্রিয় খাদ্য। সি মাখনে ভেজে সমানে খায় ওরা উই, উই-এর ডিম, বাচ্চা বেবাক।

সকাল আটটা নাগাদ গ্রামের দেখা পেলাম। নাম, বামা। গ্রামে ঢোকার আগেই একদল ওঝার দেখা পেলাম। শনের ঝালরে মুখ ঢাকা। গলায় মানুষের খুলি আর হাড়ের মালা। এই অসভ্য দেশে এরাই মাতব্বর। দারুণ খাতির এদের। কোথাও হয়তো ভূত তাড়াতে গিয়েছিল, এখন নাচতে নাচতে ফিরে চলেছে। পেছনে চলেছে ছেলে-ছোকরার দল।

মাঝে-মধ্যেই পেছনে ফিরে তাড়া করে একেকটা ছেলেকে ধরে ফেলছে ওঝারা। ধরে সবাই মিলে মন্ত্রপূত লাঠি দিয়ে সমানে পেটাচ্ছে। প্রায় আধমরা করে তবে ছাড়ছে। আর মদ গিলছে সমানে। গাছের গুঁড়ির তৈরি পিপেয় 'দোলো' মদ নিয়ে সঙ্গেই চলেছে বাহক। ঘণ্টাখানেক পরেই দেখলাম, সব ক'জন ওঝা পাঁড় মাতাল হয়ে পড়েছে।

ওঝাদের সঙ্গে সঙ্গেই গাঁয়ে এসে ঢুকলাম আমরা। তৎক্ষণাৎ ক্যাপ্টেনের

কাছে এসে আরজি পেশ করল চৌমৌকি, কুলিরা একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে, বিশ্রাম চাই। টোনগানেও এসে হাজির ক্যাপ্টেনের কাছে। সে বলল, আজকে কুলিদের মেজাজ খুবই ভাল, পথ চলা যাবে অনেক বেশি।

কিন্তু দু'জনকেই অবাক করে দিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন যে, তিনি আগে থেকেই স্থির করে রেখেছেন আজ লম্বা বিশ্রাম নেবেন। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল চৌমৌকি। কিন্তু খুশি হলো। টোনগানের দিকে চেয়ে বিচিত্র ভ্রূকুটি করে সরে পড়ল। আর ক্যাপ্টেনের সঙ্গে না পেরে মালিকের ওপর গিয়ে মেজাজ দেখাতে লাগল টোনগানে।

থাকতেই যখন হবে গ্রামটা একটু দেখে নিতে ক্ষতি কি। তাই বেরোলাম। গায়ে গায়ে লেগে থাকা কুঁড়েঘরগুলোর দরজা হচ্ছে ছাদের দিকে। দরজা মানে এক গোল ছিদ্র। এই ছিদ্র পথেই মই বেয়ে নামতে হয়। হিংস্র জানোয়ারের উৎপাত বেশি এদিকে, তাই এই ব্যবস্থা। সুতরাং আমরা ছাদ থেকে ছাদে ঘুরতে লাগলাম। কুঁড়েঘরগুলো গায়ে গায়ে লাগানো থাকায় মাটিতে আর নামতে হলো না। ছাদে ছাদে গিয়েই দাঁড়ালাম মোড়লের ঘরের ওপর।

ফরাসী স্থানীয় বাহিনীতে একজন পদাতিক সৈন্য ছিল মোড়ল, এখন অবসর নিয়েছে। কিন্তু গোঁফটা ছাঁটেনি, তামার পাইপে তামাক খেতে খেতে ফরাসী কায়দায় সাদর অভ্যর্থনা জানাল আমাদের। দোলো মদ এনে দিল। আমরা তাকে কিছু আজে-বাজে জিনিস উপহার দিলাম।

এরপর গেলাম গাঁয়ের বারোয়ারী উঠানে। সেখানে দেখলাম মাথাপিছু চার কড়ি মজুরি নিয়ে নিগ্রোদের নখ কাটছে একজন নাপিত। কাটার সঙ্গে সঙ্গে নখের মালিকেরা একটা একটা করে কুড়িয়ে নিয়ে নখগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলছে। নইলে নাকি শত্রুরা ওই নিয়ে গিয়ে যাদুমন্ত্র করে সাংঘাতিক ক্ষতি করবে। এমন কি মুখ দিয়ে রক্ত তুলে মেরে ফেলারও সম্ভাবনা আছে।

উঠানের এক কোণে ভিড় দেখে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম একটা লোক জ্বরে ভীষণ কাঁপছে। একজন কিম্ভূত পোশাক পরা ওঝা চিকিৎসায় ব্যস্ত। রোগীকে মাটিতে উপুড় করে শুইয়ে তার সামনে একটা কাঠের উপদেবতার মূর্তি রেখেছে। মন্ত্রপূত সাদা ছাই মেখেছে রোগীর মুখে। কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে থেকে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ল ওঝা। তারপর মাটিতে ফেলে রাখা একটা বেত তুলে নিয়ে বেধড়ক পেটাতে লাগল রোগীকে। ভূত তাড়াচ্ছে। ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করে উঠল রোগী! মিনিট পাঁচেক সমানে পিটিয়ে বেতটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ওঝা। তারপর পাশে বসে পড়ে রোগীর ঘাড়ের এক জায়গায় হাত রাখল। হাতটা আবার তুলে নিতেই দেখা গেল মুঠোয় মানুষের একটা কড়ে আঙুল। আঙুলের রূপ নিয়ে রোগীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে ভূত। পরিষ্কার হাত সাফাই। আঙুলটা দেখেই হৈ হৈ করে উঠল দর্শকরা। গম্ভীর হয়ে গোঁফে তা দিতে দিতে দর্শকদের দিকে চাইল ওঝা, আর মুচকে মুচকে হাসতে লাগল। এই ফাঁকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই রোগী দিল চম্পট। এতে আরও হতবাক হয়ে গেল দর্শকরা। কি তাড়াতাড়ি সেরে উঠল রোগী!

ডক্টর চাতোন্নেও এসেছেন আমার সঙ্গে। ব্যাপার দেখে রেগে উঠলেন তিনি। নজর রাখলেন কোন্ কুঁড়েঘরে গিয়ে ঢুকল জ্বরের রোগী। তারপর আমাকে নিয়ে গিয়ে সেই কুঁড়েতে ঢুকলেন। মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে দারুণ কাঁপছে আর

কোকাচ্ছে মুমূর্ষু লোকটা, আবার পিটুনীর ভয়েই শুধু পালিয়ে এসেছে সে। তাকে পরীক্ষা করে দেখে ওষুধ দিলেন ডক্টর। কিন্তু ওঝাই যখন ব্যর্থ হয়েছে তখন আর একজন ভদ্র চেহারার বিদেশীর কথা ভূত শুনবে, একথা বিশ্বাস করতে পারল না লোকটা। নেহাত অনিচ্ছা সত্ত্বেও খেল সে ডাক্তারের ওষুধ। আরও কয়েক পুরিয়া ওষুধ খাবার জন্যে দিয়ে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার।

ফেব্রুয়ারি ১২। গ্রাম ছাড়ার আগের মুহূর্তে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল একটা লোক। কাছে আসতেই চিনলাম, গতকালকের সেই জ্বরের রোগী। জ্বর একেবারে ছেড়ে গেছে তার। এসেছে ডাক্তারকে কৃতজ্ঞতা জানাতে।

কোন বৈচিত্র্য নেই পথে। একঘেয়ে চলা। অব্যাহত রয়েছে চৌমৌকির চালাকি। দুপুরে এসে সে আস্তে আস্তে কি যেন বলল ক্যাপ্টেনকে, দূর থেকে শুনতে পেলাম না। কিন্তু মিনিট দশেক পরেই আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন, আজ আর চলা হবে না। আগামীদিন সকাল পর্যন্ত বিশ্রাম, দুপুরের খাওয়ার পর তাঁবু গুটানো হবে। একটানা বারো মাইল চলে তারপর আবার থামা হবে।

অদ্ভুত সেই আওয়াজটা আজ আবার শোনা গেল। বিকেল ছ'টার সময়ে এখনও দিনের আলো রয়েছে। পুব দিক থেকেই আসছে আওয়াজ। ভয় পেয়ে গিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে প্রার্থনা শুরু করে দিয়েছে নিগ্রোরা। সামনে চাইলাম। কিন্তু বিশাল এক পাহাড় দৃষ্টি পথ জুড়ে আছে। ছুটলাম, পাহাড়ে উঠব। ক্রমেই বাড়ছে আওয়াজ। হাঁপাতে হাঁপাতে আমরা উঠলাম চূড়ায়। তীক্ষ্ণ চোখে চাইতে লাগলাম শব্দের উৎস বরাবর। মনে হলো মেঘের ভেতর থেকে আসছে শব্দটা, দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। একসময় শব্দ পশ্চিমে মিলিয়ে গেল। আমরা আবার নেমে এলাম পাহাড় থেকে। পাহাড় জঙ্গলের নিয়ম অনুযায়ী রাত নামছে দ্রুত। তাঁবুতে ফিরে এলাম।

ডায়েরী লিখছি। দূর থেকে ভেসে আসছে নিশাচর জানোয়ারের ডাক। কাছেই কোথাও থেকে বিচ্ছিরি অট্টহাসি হেসে উঠল একটা হায়েনা। ঠিক এমন সময়ে আবার শোনা গেল সেই রহস্যময় আওয়াজ। পশ্চিম থেকে এসে আস্তে আস্তে পুবে সরে গেল। এ কি রহস্য? কিসের এই শব্দ? গর্জনে কানে তালা লেগে যাচ্ছে, অথচ কিছুই দেখতে পাচ্ছি না! সত্যিই কি অদৃশ্য প্রেত? কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অমন কথা কি করে বিশ্বাস করি?

ফেব্রুয়ারি ১৩। দেরি করে উঠেছি ঘুম থেকে। তাড়াতাড়ি উঠেই বা লাভ কি। যাত্রা তো শুরু হবে সেই দুপুরের পরে। বাইরে বেরিয়ে দেখি পাহাড়ের কোলে একটা গাছের গোড়ায় বসে আলাপ করছে টোনগানে আর মালিক। তাঁবুর পাশে মাটিতেই চট বিছিয়ে বসে অতি মনোযোগের সঙ্গে কাগজে কি লিখছেন মঁসিয়ে পসিঁ। হয়তো অঙ্ক করছেন। সকালের কচি রোদে পায়চারি করছেন মঁসিয়ে বারজাক। দুটো তাঁবুর মাঝখানে এক জায়গায় বসে বসে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলছেন মিস ব্লেজন। সেন্ট বেরেনকে দেখলাম না কোথাও। হয়তো মাছ ধরতে বেরিয়েছেন কিংবা ব্যাঙ—নিদেনপক্ষে ইগুয়ানা।

চৌমৌকিকেও দেখলাম না কোথাও। ভেবেছিলাম গত কয়েকদিনের লেখা রিপোর্টগুলো দেব তাকে। এতদিন রিপোর্টগুলো তো সেই-ই পাঠিয়ে এসেছে লোক মারফত।

ফেব্রুয়ারি ১৪। একটা বেশ বড়সড় ঘটনা ঘটল আজ। সেই যে গতকাল উধাও হয়েছে, আজ সকাল আটটায়ও চৌমৌকির কোন পাত্তা নেই। তাকে ছাড়াই, শুধু টোনগানের ওপর নির্ভর করে রওনা দেব ভাবছি, এমন সময় দূরে একদল লোক আসতে দেখা গেল। ঘোড়ার পিঠে চেপে আসছে তারা। আরও কাছে আসতে বোঝা গেল, সৈন্যদল।

নিজের সৈন্যদের দ্রুত তৈরি হবার আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন মারসিনে। চোখের পলকে অস্ত্র নিয়ে লড়াইয়ের ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে গেল সবাই। পরবর্তী হুকুমের অপেক্ষা শুধু, তারপর বিদ্যুৎগতিতে পজিশন নিয়ে লড়াই শুরু করে দেবে।

আরও কাছে এল দলটা। পরিষ্কার চিনতে পারলাম ফরাসী সামরিক ইউনিফর্ম পরা বিশজন নিগ্রো সৈন্যকে নিয়ে আসছে তিনজন ফরাসী অফিসার, দলের নেতা একজন লেফটেন্যান্ট।

ক্যাপ্টেন মারসিনের হুকুমে আমাদের বাহিনীর একজন সার্জেন্ট নবাগতদের সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে গেল। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলার কোন লক্ষণই দেখা গেল না লেফটেন্যান্টের মধ্যে। সোজা এগিয়ে এল ক্যাপ্টেনের কাছে। ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে জিজ্ঞেস করল, 'ক্যাপ্টেন মারসিনে?'

'ইয়েস, লেফটেন্যান্ট।'

সজোরে বুট ঠুকে স্যালুট করল লেফটেন্যান্ট। 'আমি লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর, স্যার। সুদানীজ ভলান্টিয়ার ঘোড়সওয়ার বাহিনীর বাহাত্তরতম কলোনিয়াল ইনফ্যানট্রির চার্জে আছি। বামাকো থেকে আসছি। আপনাদের পেছনেই ছিলাম, অল্পের জন্যে ধরতে পারিনি সিকাসোতে।'

'কেন?'

'এই যে নিন,' পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে দিল ল্যাকোর, 'এই চিঠিটা পড়লেই বুঝবেন।'

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে খুললেন ক্যাপ্টেন। পড়তেই তাঁর মুখের ভাব পুরো বদলে গেল। বিস্ময় আর নিরাশার ছাপ ফুটে উঠল মুখে।

'কিন্তু এখুনি কিছু বলতে পারছি না আমি, লেফটেন্যান্ট। আমি এখন মঁসিয়ে বারজাকের অধীন। ওঁর অনুমতি নিতে হবে।'

বারজাকের কাছে এগিয়ে এসে হাতে চিঠিটা তুলে দিলেন ক্যাপ্টেন। আমাদেরকে বললেন, 'আপনাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

শোনা মাত্রই ফ্যাকাসে হয়ে গেল মিস জেন ব্লেজনের মুখ, কিন্তু সামলে নিলেন পরক্ষণেই।

চিঠিটা খুলে দেখার প্রয়োজন বোধ করলেন না মঁসিয়ে বারজাক। জিজ্ঞেস করলেন, 'মানে?'

'টিম্বাকটুতে যাবার হুকুম এসেছে।'

'কে দিল হুকুম?'

'পড়েই দেখুন।'

দ্রুত চিঠিটা পড়লেন মঁসিয়ে বারজাক। তারপর আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, জোরে জোরে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে পড়লাম আমি:

ফ্রান্স গণতন্ত্র
গভর্নমেন্ট জেনারেল দ্য সেনেগাল
সার্কল দ্য বামাকো।

অনতিবিলম্বে সিগো সিকোরোতে রিপোর্ট করতে আদেশ দেয়া হচ্ছে ক্যাপ্টেন পিয়ের মারসিনেকে। সেখানে ছাউনিতে রিপোর্ট করে যাবেন টিম্বাকটুতে। ডিসট্রিক্ট কমান্ডারের কাছে রিপোর্ট করবেন।

ক্যাপ্টেন মারসিনের কাজ বুঝে নেবেন বাহাত্তরতম কলোনিয়াল ইনফ্যানট্রির লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর। নাইজার বেণ্ডের এক্সট্রা-পার্লামেন্টারি মিশন চীফ মঁসিয়ে বারজাকের অধীনে থেকে মিশনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।

—কর্নেল কমান্ডিং
লা সার্কল দ্য বামাকো, সেন্ট অবান।

আমার পড়া শেষ হতেই চেঁচিয়ে উঠলেন বারজাক, 'ফাজলেমির আর জায়গা পায়নি। একশোজন সৈন্যের জায়গায় মাত্র বিশজন। প্যারিসে একবার যাই, চেম্বারের মেম্বারের সঙ্গে ইয়ার্কির মজা দেখাব আমি কমান্ডিং অফিসারকে!'

'কিন্তু আমার তো হুকুম না মেনে উপায় নেই মঁসিয়ে বারজাক, স্যার।'

ক্যাপ্টেনকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গেলেন মঁসিয়ে বারজাক। তারপর কি মনে করে হাতছানি দিয়ে আমাকেও ডাকলেন। বললেন, 'রিপোর্টার মানুষ আপনি। সব কথাই জানা থাকা দরকার।'

ক্যাপ্টেনকে বললেন, 'অর্ডারটা জালও হতে পারে, ক্যাপ্টেন।'

'জাল!' চমকে উঠলেন যেন ক্যাপ্টেন, 'অসম্ভব! হতেই পারে না। চিঠির সীলমোহর ঠিক আছে। তাছাড়া কর্নেল অবানের অধীনে কাজ করেছি আমি। সইটা ভালমতই চিনি। নাহ্, স্যার, জাল হতে পারে না।'

হঠাৎই চুপ মেরে গেলেন বারজাক। কিন্তু মুখ দেখেই বুঝলাম, ব্যাপারটা মোটেই মনঃপূত হচ্ছে না তাঁর।

লেফটেন্যান্ট ল্যাকোরকে ডেকে বারজাকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন।

তীব্র গলায় লেফটেন্যান্টকে জিজ্ঞেস করলেন মঁসিয়ে বারজাক, 'হঠাৎ এই হুকুমের কারণ?'

'আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তোয়ারেপরা। ছুটকো ছাটকা আক্রমণ শুরু করেছে। টিম্বাকটুতে তাই সৈন্য বেশি দরকার এখন। যেখান থেকে পারছেন, কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে এখন শক্তি বাড়াচ্ছেন কর্নেল অবান।'

'কিন্তু তিনি কি জানেন না যে মাত্র কুড়িজনে আমাদের চলবে না? সাংঘাতিক বিপদের ভয় পদে পদে?'

'মিছে আশঙ্কা আপনার, স্যার। এ অঞ্চল ভালভাবেই চিনি আমি। এখন পুরো শান্ত।' অভয় দিয়ে বলল ল্যাকোর।

'অথচ কলোনি মিনিস্টার নিজে চেম্বারে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন যে নাইজারে একের পর এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটছে। কোনাক্রি রেসিডেন্টও সমর্থন করেছে এ কথা।'

'বাসি হয়ে গেছে খবরটা,' হেসে বলল ল্যাকোর, 'সব এখন শান্ত, স্যার।'

'মানতে পারছি না।' আমাদের আসার পথে যেসব বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটেছে তা জানালেন বারজাক।

'সব তুচ্ছ ঘটনা।' এক বিন্দু মলিন হলো না ল্যাকোরের মুখের হাসি। 'আমি থাকতে আপনাদের ক্ষতি করতে পারে এমন ক্ষমতা এদিকে কারও নেই,' দৃঢ় গলায় বলল সে।

এরপর আর কিছু বলার থাকল না বারজাকের।

'তাহলে আমাকে অনুমতি দিন, স্যার,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'রওনা হতে হবে এখুনি।'

'ঠিক আছে, যান।' নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায় দিলেন বারজাক।

সৈন্যদলকে তৈরি হওয়ার আদেশ দিয়ে একে একে আমাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিলেন ক্যাপ্টেন। মিস ব্লেজনের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে শুধু একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'আসি।'

'এসো।'

বুঝলাম আবার ফিরে আসবেন ক্যাপ্টেন মারসিনে। মিস ব্লেজনের খাতিরেই আসবেন। 'এসো,' ওই একটি শব্দেই অনেক কথা বলা হয়ে গেছে।

ক্যাপ্টেনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সঙ্গে একজন গাইড এনেছে ল্যাকোর। দলবল নিয়ে রওনা হলেন ক্যাপ্টেন। যতদূর দেখা গেল, ঠায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলাম আমরা। একশো ঘোড়সওয়ার নিয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন পিয়ের মারসিনে। অন্যদের কথা জানি না, কিন্তু আমার মনে হলো একটা অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ যেন খসে পড়ে গেল শরীর থেকে।

লেফটেন্যান্ট ল্যাকোরের বিশজন সৈন্যের দিকে তাকালাম। নিজের অজান্তেই ছমছম করে উঠল গা'টা। প্রতিটি লোকের সঙ্গে যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ভয়ঙ্কর বিপদ।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল কথাটা। মিস জেন ব্লেজনের মনের মানুষ ছেড়ে চলে যাবেন, ওঝার এই ভবিষ্যদ্বাণীও তো সফল হলো! শেষ কথাটাও হবে না তো?

দশ

ফেব্রুয়ারি ১৪। সন্ধ্যা। পরিষ্কার বুঝতে পারছি বিপদে পড়েছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না বিপদটা কি ধরনের। কাদের সঙ্গে চলেছি আমরা? আমার মন বলছে, সশস্ত্র প্রহরীর বেশে যারা এসেছে আমাদের পথ দেখানোর জন্যে, তারা আর যাই হোক, ফরাসী সরকারের অধীনস্থ কর্মচারী নয়। তাহলে কারা এরা? ক্যাপ্টেন মারসিনে জোর দিয়ে বলেছেন যে চিঠিটা কর্নেল অবানেরই লেখা। কিন্তু বারজাকের মত আমিও কথাটা বিশ্বাস করতে পারছি না কেন?

আরেকটা ব্যাপারে সেই প্রথম থেকেই খটকা লেগেছে আমার। আমাদের

পেছনে পেছনে হন্তদন্ত হয়ে পনেরো দিন ধরে ছুটে আসা লোকগুলোর তো সারা শরীর ধূলিধূসরিত থাকার কথা—সেটাই স্বাভাবিক; কিন্তু দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট সবাই। আর লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর তো যেন জামাই সেজে এসেছে।

শুধু জামা-কাপড়ই যে পরিষ্কার তাই নয়, চোখে মুখে বিন্দুমাত্র ক্লান্তির চিহ্ন নেই ল্যাকোরের। দেখে শুনে মনে হচ্ছে, জোর করে অফিসার সাজতে চাইছে লোকটা। চেহারায়, চলনে বলনে ফরাসী সামরিক অফিসারের স্মার্টনেসের কোন চিহ্নই নেই তার মধ্যে। কড়া করে মোম মাখানো গোঁফ, যেন মাত্র ব্যান্ডবক্স থেকে বেরিয়ে এসেছে, সৈনিক-ছাউনি থেকে নয়। চকচকে পালিশ করা আনকোরা নতুন জুতো যেন থিয়েটারের অভিনেতার পায়েই বেশি ভাল মানাত।

আসলে বেশি বাড়াবাড়ি করতে গিয়েই ধরা পড়ে যাচ্ছে ল্যাকোর। আর লেফটেন্যান্ট বলব না তাকে। কারণ, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে কোনকালেই ফরাসী সেনাবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট ছিল না সে।

ওদিকে ল্যাকোরের ঠিক উল্টো তার সার্জেন্ট দু'জন। সামরিক পোশাক আছে ঠিকই, কিন্তু মলিন, শতচ্ছিন্ন। আরও অবাক কাণ্ড, ইউনিফর্মের রেজিমেন্টের নম্বর, চিহ্ন কিছুই নেই ওদের। মলিন শুধু পোশাকই, তাদের চেহারা কিন্তু দিব্যি চকচকে যেন মাত্র জাহাজ থেকে নেমে এসেছে, আর আসার সময়ে কুড়িয়ে নিয়ে পরে এসেছে কাপড়গুলো। হঠাৎই সন্দেহটা জাগল মনে—লুট করেনি তো?

বিশ্বাস করতে পারছি না এদের আমি কিছুতেই, কিন্তু আবার অবিশ্বাসের তেমন কোন কারণও খুঁজে পাচ্ছি না।

একটা ব্যাপারে কিন্তু দুনিয়ার যে কোন উন্নতমানের সেনাবাহিনীর সমতুল্য এর নিয়মানুবর্তিতা। ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে, বিন্দুমাত্র ভুলত্রুটি নেই, কাজে অবহেলা নেই, বিশ্রামের জন্যেও লালায়িত নয় কেউ। একজন সেন্ট্রির যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে এসে যাচ্ছে তার বদলী। যন্ত্রের মত নিখুঁত ভাবে চলছে সব।

তিনটে দলে বিভক্ত তেইশজনের দলটা। বিশজন নিগ্রো সৈন্যের ভলান্টিয়ার দলটার কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না। নীরবে খায়-দায়-ঘুমোয়। আশ্চর্যের ব্যাপার! নিগ্রোদের স্বভাবের সঙ্গে একেবারেই বেমানান!

যমের মত ভয় করে চলে এরা সার্জেন্ট দু'জনকে। আর ল্যাকোরকে তো বলতে গেলে আল্লাহ মানে। চোখের ইঙ্গিত মাত্র নীরবে হুকুম পালন করে চলে। সারাক্ষণই যেন কোন অজানা আতঙ্কে কাঠ হয়ে থাকে সিপাইরা।

শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যেই মাঝেসাঝে কথা বলে সার্জেন্ট দু'জন, তাও চাপা গলায়। আড়ালে-আবডালে লুকিয়েও ওদের কথা শুনতে পারছি না আমি। তবে চেষ্টা অব্যাহত রাখছি।

সারাক্ষণ একেবারে একা থাকে ল্যাকোর। বেঁটে। ডাকাতের মত রুক্ষ, ইস্পাতের মত কঠিন দুই চোখ। ঠোঁট দুটো দেখলেই বোঝা যায় ভয়ঙ্কর প্রকৃতির নিষ্ঠুর এই লোক। সারা বিকেলে মাত্র দু'বার সাক্ষাৎ হয়েছে তার সঙ্গে আমার, কিন্তু কোনবারেই কথা হয়নি। শুধু দলের লোকদের হুকুম দিতেই তাঁবু থেকে বেরিয়েছিল সে।

ল্যাকোরকে দেখামাত্রই যে যেখানে ছিল লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে বিশজন

সিপাই। একেবারে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। যেন কাঠের পুতুল। কঠিন স্বরে সিপাইদের নয়, সার্জেন্ট দু'জনকে হুকুম দিয়েই আবার গিয়ে তাঁবুতে ঢুকেছে ল্যাকোর।

ক্যাপ্টেন মারসিনে চলে যাবার পর সারাটা দিনে একবারও মিস জেনের দেখা পাইনি। তাঁবু থেকে বেরোননি।

আর হ্যাঁ, এখনও ফেরেনি চৌমৌকি।

ফেব্রুয়ারি ১৫। সকালে দেরি করে তাঁবু থেকে বেরোলাম। আজও বিশ্রাম নেয়া হবে। টোনগানেকে জিজ্ঞেস করে জানলাম ব্যাপারটা। গতকালও সারাটা দিন বিশ্রাম গেছে, আজ আবার কেন?

অতি ফিটফাট ল্যাকোরের সঙ্গে আচমকা দেখা হয়ে যেতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'এই যে, লেফটেন্যান্ট, আজ আবার বিশ্রাম কেন?'

'মঁসিয়ে বারজাকের হুকুম,' তিনটে শব্দে উত্তরটা দিয়েই গটগট করে চলে গেল ল্যাকোর।

ব্যাপারটা কি? ভাবনায় পড়লাম আমি। সৈন্যসংখ্যা কমে যাওয়াতেই কি অভিযান বন্ধ রেখেছেন বারজাক? নাহ, জিজ্ঞেস করেই দেখতে হচ্ছে।

আমি তাঁবুর কাছাকাছি যেতেই দেখলাম, ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছেন বারজাক। আমার দিকে নজর নেই। পেছনে হাত, চোখ মাটির দিকে। চিন্তাচ্ছন্ন। বেরিয়েই পায়চারি করতে শুরু করলেন।

এগিয়ে গিয়ে ডাকলাম, 'মঁসিয়ে বারজাক?'

'কে?' মুখ তুলে চাইলেন বারজাক, 'ও, রিপোর্টার? আসুন। তারপর কি খবর?'

'আজও নাকি থেকে যেতে চাইছেন? কেন?'

'আসলে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না।'

'কি সিদ্ধান্ত?'

'এগোব, নাকি ফিরে যাব। আসুন না, আমরা দু'জনে মিলে পরামর্শ করে দেখি?'

'বেশ তো।'

'অভিযান চালিয়ে গেলে যে কি হবে বোঝা হয়ে গেছে আমার, নতুন আর কিছুই পাব না।'

'ঠিক।'

'এদিকে সৈন্যসংখ্যা এখন আগের তুলনায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এত কম লোক নিয়ে আরও দুর্গম এলাকায় ঢোকা কি উচিত হবে?'

'কিন্তু এর চাইতে কম লোক নিয়েও তো এর চেয়ে দুর্গম এলাকায় পাড়ি দিয়েছে মানুষ। তবে কথা সেটা নয়···।'

'জানি কি বলবেন। কেউ একজন আমাদের ভয় দেখাতে চাইছে, এগোতে বাধা দিচ্ছে। ওসব কথা আর ভাল লাগছে না।'

কথার মোড় ঘোরালাম। নতুন সৈন্য আর অফিসারদের কথা তুলে আমার মনের সমস্ত সন্দেহের কথা জানালাম বারজাককে। কিন্তু হাসতে লাগলেন তিনি।

বললেন, আপনার কল্পনা শক্তির তারিফ না করে পারছি না, মঁসিয়ে ফ্লোরেন্স। কিন্তু ওসব আপনার ভুল ধারণা। কর্নেল অবানের সই জাল হতে পারে না কিছুতেই। ক্যাপ্টেন মারসিনের মত ঝানু অফিসার তাঁর কমান্ডিং অফিসারের সই না চেনার মত বোকা নন।'

'চুরি করে আনা হতে পারে চিঠিটা, কিংবা ছিনিয়ে আনা হতে পারে।'

'চুরি অসম্ভব, আর কর্নেলের পাঠানো লোকদের কাছ থেকে ল্যাকোর চিঠি ছিনিয়ে নিতে গেলে মারাত্মক লড়াই হত। সেক্ষেত্রে ল্যাকোরের দলের লোকেরাও অন্তত পক্ষে জখম হতই। কিন্তু এখানে যারা এসেছে তাদের গায়ে একটা আঁচড়ও নেই। তাছাড়া সুদানীজ ভলান্টিয়ার নয় বলে এদের সন্দেহ করার কোন কারণই নেই। একেবারে নিখুঁত চালচলন।'

'কিন্তু সার্জেন্ট দু'জনের কাপড় দেখেছেন?'

'ক্যাপ্টেন মারসিনের সার্জেন্টদের কাপড়ই বা তত ভাল ছিল কোথায়? আর তাছাড়া পনেরো দিন জঙ্গল ভেঙে এলে কাপড়চোপড় থাকে?'

'ল্যাকোরের পোশাক তো একেবারে আনকোরা! যেন সদ্য ভাঁজ ভেঙে পরেছে।'

'ফরাসী সেনাবাহিনীর অনেক অফিসারই ফিটফাট থাকতে ভালবাসে। সঙ্গে করে নিশ্চয়ই নতুন ইউনিফর্ম এনেছিল লেফটেন্যান্ট। ওর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। শিক্ষিত, বিনীত, ভদ্র। অহেতুক কোন কথা বলে না। তাছাড়া লোকের সম্মান দিতে জানে।'

একটু থেমে আমার চোখের দিকে চাইলেন বারজাক। একটু জোর দিয়েই বললেন, 'তাছাড়া কথা শোনে।'

'তা অভিযান চালিয়ে যাওয়া সম্পর্কে আপনার কি মত। অসুবিধে হবে?'

'মোটেই না।'

'কিন্তু তবু দ্বিধায় রয়েছেন, বুঝতে পারছি।'

'কালই রওনা হব। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।'

'গিয়ে আর কোন লাভ নেই জেনেও?'

বুঝলাম ঠিক জায়গায় গিয়ে লেগেছে খোঁচাটা, বললেন, 'দেখুন, অভিযান চালিয়ে যেতেই হবে এখন।'

'কারণ?'

হঠাৎই গলার স্বর খাটো করে আনলেন বারজাক, 'দেখুন মঁসিয়ে, আপনাকে বলতে দোষ নেই; অনেক আগেই বুঝে নিয়েছি, এই বর্বরদের ভোটার বানানো যায় না। আপনি কিন্তু আবার বলে দেবেন না চেম্বারে। অভিযান শেষ করতেই হবে নইলে রিপোর্ট দিতে পারব না ঠিকমত। ফিরে গিয়ে আমি আমার রিপোর্ট দেব, বদ্রিয়ার্স দেবেন তাঁরটা। দুটো রিপোর্টই খতিয়ে দেখবে কমিশন। ফলে হয় আমার মুখ রাখার জন্যে অতি সভ্য কিছু নেটিভকে ভোটার করা হবে, কিংবা আদৌ করাই হবে না। এবং সেক্ষেত্রেও আমি উচ্চবাচ্য কিছু করব না। সমস্ত ব্যাপারটা ভুলে যেতে লোকের সাতদিনও লাগবে না। কিন্তু অভিযান বন্ধ করে যদি ফিরে যাই, আমাকে আস্ত রাখবে না বিরোধীপক্ষ। হেরে যাব আমি। পলিটিকসের একটা

গোপন কথা বলি, কোন সময় ভুল করে তা স্বীকার করতে নেই। তাহলেই হয়েছে, ভোটে জিততে হবে না আর কোনদিন।'

আর কথা বাড়ালাম না। পরিষ্কার করেই সব কথা বলেছেন বারজাক।

বারজাকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের তাঁবুতে ফেরার সময়, ফোল্ডিং চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে নিজের নোটবইটা পড়তে দেখলাম পর্সিকে। রিপোর্টারের স্বাভাবিক কৌতূহল মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। একদম কথা বলেন না ভদ্রলোক। দিনরাত শুধু নিজের নোটবইয়ে কি লেখেন আর আপন মনেই বিড়বিড় করেন। নাহ্, দেখতেই হবে তাঁর নোটবইটা। সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম এবং পেয়েও গেলাম।

আধ ঘণ্টা পরেই, বোধ হয় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ফোল্ডিং চেয়ারের ওপর নোটবইটা রেখে চলে গেলেন পর্সি। বিন্দু মাত্র দেরি না করে নোটবইয়ের শেষ লেখা পাতাটা খুললাম। দুর্বোধ্য কিছু সঙ্কেত লেখা আছে। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। তবু পরে মাথা ঘামিয়ে দেখা যাবে ভেবে তাড়াতাড়ি নিজের নোটবইয়ে টুকে নিলাম সঙ্কেতগুলো: 'পি. জে. ০, ০০৯', 'পি. কে. সি. ১৩৫, ০৮', 'ম. ৭৬১'...,' এমনি সব।

এগুলো আবার কি লেখা রে বাবা! মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি লোকটার! নইলে নোটবইয়ে এসব হেঁয়ালি কেন? সঙ্কেতের অর্থ বের করার সত্যিই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। সঙ্কেতগুলো টুকে নিয়ে নোটবইটা আবার যথাস্থানে রেখে পর্সি ফিরে আসার আগেই কেটে পড়লাম।

আশপাশটায় একটু চক্কর দিতে বেরোলাম বিকেল বেলা। সঙ্গে টোনগানে। ঘোড়ায় চড়েই চলেছি দু'জনে—চৌমৌকির ঘোড়াটা নিয়েছে টোনগানে। ভাল ঘোড়া দেখলেই দখল করে নেয়ার তালে থাকে ও।

রওনা দেবার পর থেকেই কথা বলার জন্যে উসখুস করছিল টোনগানে। ক্যাম্পের কাছ থেকে সরে আসার পর আর থাকতে পারল না, বলেই ফেলল, 'লোকটা একেবারে বদমাশ! বিশ্বাসঘাতক!'

'কে। কার কথা বলছ?'

'চৌমৌকি হারামজাদা। ওর ওস্তাদ মোরিলিরের মতই পাজী। কুলিদের সোনার টাকা দিত দু'জনেই। গোপনে মদ সরবরাহ করত। আর বলত, বেশি হাঁটবি না, অল্পতেই কাহিল হয়ে পড়ার ভান করবি।'

'কড়ি দিত, বলছ বোধহয় তুমি?' চেমৌকি আর মোরিলিরের হাতে সোনার টাকা থাকবে বিশ্বাস করতে পারলাম না।'

'সোনার টাকা! ইংলিশ!' জোর দিয়ে বলল টোনগানে।

'ইংলিশ সোনার টাকা চেনো?'

'চিনব না মানে? কত দেখলাম।'

একটু ভেবে নিলাম। কথা আদায় করতে হবে টোনগানের কাছ থেকে। পকেট থেকে একটা সোনার ফরাসী টাকা বের করে বাড়িয়ে ধরলাম, 'এই নাও, রাখো।'

হাত বাড়িয়ে মোহরটা নিল টোনগানে। খুশিতে সব দাঁত বেরিয়ে পড়েছে তার। মোহরটা জিনের সঙ্গে আটকানো ব্যাগে রাখতে গিয়েই থমকে গেল। বিস্ময়

ফুটেছে চোখেমুখে। রোল পাকানো একগাদা কাগজ টেনে বের করল ভেতর থেকে। দেখেই চিনলাম। আমার লেখা রিপোর্ট। 'লা এক্সপ্যানসন ফ্রাঁসে' পত্রিকায় পাঠানোর জন্যে চৌমৌকির হাতে দিয়েছিলাম। পাঠায়নি। লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। জঙলী ওঝার তিনটে ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হলো তাহলে। বাকি আর একটা রইল। সেটা ফললেই ষোলোকলা পূর্ণ হয়।

খারাপ হয়ে গেল মনটা। নীরবে টোনগানের পাশে পাশে এগিয়ে চলেছি। একটা খোলা জমিনের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মাটির দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। রাশ টেনে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে ফেললাম।

ছ'সাত গজ চওড়া আর প্রায় পঞ্চাশ গজ লম্বা কয়েকটা দাগ। এই দাগ আগেও দেখেছি। কেটে বসে গেছে জমিতে। আজব সেই শব্দ প্রথম শোনার পরদিন এই রকম দাগই দেখেছিলাম ক্যাম্পের কিছুদূরের মাটিতে, কানকানে।

আজব ওই আওয়াজের সঙ্গে এই দাগের কি সম্পর্ক আছে? ক্রমেই জমাট বাঁধছে রহস্য। হালকা হচ্ছে না কিছুতেই। একের পর এক শুধু ঘটেই চলেছে রহস্যজনক ঘটনা!

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তাঁবুতে ফিরে চললাম।

আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে চলেছি। ক্যাম্পের কাছাকাছি এসেই হঠাৎ নীরবতা ভাঙল টোনগানে, 'ল্যাকোর লোকটাকে মোটেই পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

'আমারও না,' সায় দিলাম আমি।

ফেব্রুয়ারি ১৭। এখনও ফেরেনি চৌমৌকি। কিন্তু তাকে ছাড়াও মোটামুটি ভালই পথ চলেছি আমরা। সে থাকতে বরং আরও কম এগোতাম। গত দু'দিনে পাড়ি দিয়েছি মোট তিরিশ মাইল। এখন দিব্যি হাঁটছে কুলিরা। ল্যাকোরের ভয়েই হয়তো। তাদের দু'পাশ আগলে চলেছে বিশজন নিগ্রো সৈন্য। পেছনে দুই সার্জেন্ট। ক্যাপ্টেন মারসিনের নিগ্রো সৈন্যেরা কুলিদের সঙ্গে কথা বলত, এমনকি হাসি-ঠাট্টা পর্যন্ত করত নিজেদের মধ্যে। অথচ ল্যাকোরের লোকগুলো একেবারে গোমড়ামুখো। নিজের জাতভাইদের সঙ্গে পর্যন্ত একটা কথা নেই।

বারজাকের পাশে পাশে চলেছে ল্যাকোর। পিছিয়ে এসে, পার্সি আর চাতোন্নের পেছনে সেন্ট বেরেনের পাশাপাশি চলেছেন মিস ব্রেজন। ল্যাকোরকে একেবারেই পছন্দ করেন না তিনি।

সকাল নটা নাগাদ একটা গ্রামে এসে পৌঁছুলাম। কিন্তু গোটা গ্রাম একেবারে খাঁ খাঁ করছে। জনমানবের ছায়াও নেই। গেল কোথায় এরা সব! গ্রামের পাশ দিয়ে চলার সময় একটা ঘরের ভেতর থেকে চাপা আর্ত-গোঙানি শোনা গেল। আমি আর ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিলাম। শিউরে উঠলাম। ভেতরে বীভৎস দৃশ্য! ঘরের মেঝেতে মরে পড়ে আছে দু'জন লোক। একজন পুরুষ একজন মেয়ে। দু'জনেরই সমস্ত দেহ ফালাফালা করে চেরা। পচে, ফুলে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, টেকা দায়। নাকে হাত দিলাম। তৃতীয় একজন বুড়ো লোক পড়ে কাতরাচ্ছে। সাংঘাতিকভাবে জখম হয়ে রয়েছে সে।

কাঁধের হাড় একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেছে লোকটার। সাংঘাতিক জখম ভেদ করে বেরিয়ে পড়েছে ভাঙা হাড়ের টুকরো। পচন ধরেছে জখমে। কোন্ অস্ত্র অমন

মারাত্মক জখম করতে পারে বুঝলাম না।

এগিয়ে গেলেন ডক্টর চাতোন্নে। বুড়োর পাশে বসে পড়ে জখম পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। ঘরের ভেতরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। ভাল দেখা যায় না। লোকটাকে বাইরে বের করা দরকার। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারজাককে ডাকলেন ডাক্তার।

বারজাকের সঙ্গে সঙ্গে এল ল্যাকোর, মিস জেন, সেন্ট বেরেন ও পসি। সার্জেন্ট দু'জন। টোনগানে আর কয়েকজন কুলিও এল। বুড়োকে ধরাধরি করে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এল দু'জন কুলি।

ঘরের বাইরে উঠানে লোকটাকে চিত করে শুইয়ে আরেকবার তার জখম পরীক্ষা করলেন ডাক্তার। ক্ষতস্থান থেকে বের করলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য সীসের টুকরো। তারপর ব্যান্ডেজ বাঁধতে লাগলেন। পাশে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা ডাক্তারী সরঞ্জাম এগিয়ে দিল ল্যাকোর। সমানে চিৎকার করছিল বুড়ো লোকটা।

বুড়োর ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করে আবার ঘরে ঢুকলেন ডাক্তার। লাশ দুটোকে পরীক্ষা করলেন, তারপর একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে আবার বেরিয়ে এলেন বাইরে।

বুড়োর চিৎকার একটু কমেছে ততক্ষণে। টোনগানেকে দিয়ে জিজ্ঞেস করালেন ডাক্তার, ব্যাপার কি? কি করে ঘটল এমন?

কোকাতে কোকাতে আস্তে আস্তে বলে গেল বুড়ো। অনুবাদ করল টোনগানে:

'দিন ছ'য়েক আগে, মানে এগারো তারিখে, দু'জন সাদা মানুষ এসে হানা দেয় এই গ্রামে। একটা কুঁড়েতে ঢুকে কথা নেই বার্তা নেই, সামনে মেয়ে-পুরুষ দু'জনকে দেখে গুলি চালায়। সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় দু'জন। কুঁড়েঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে নিগ্রোরা। ভেতরের দৃশ্য দেখে আঁতকে ওঠে। বিন্দুমাত্র দেরি না করে বনের দিকে ছুটে পালায় তারা। একটু পিছিয়ে পড়েছিল বুড়ো। এমন সময় কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে আসে সাদা লোক দু'জন। পেছন থেকে আবার গুলি চালায়। কাঁধের কাছে সাংঘাতিক এক ধাক্কা খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বুড়ো। পরে লোক দু'জন চলে গেলে গাঁয়ের লোকেরা বুড়োকে ধরাধরি করে নিয়ে আসে। এই কুঁড়েতেই শুইয়ে রাখে। তারপর ভয়ে সবাই গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। এ ধরনের ব্যাপার নাকি আশেপাশের গাঁয়েও ঘটেছে। ভয়াবহ আতঙ্কের মাঝে দিন কাটাচ্ছে এসব এলাকার লোকেরা। অনেকেই পালাচ্ছে দূরের গাঁয়ে।'

অদ্ভুত কাণ্ড! অজানা ভয় এসে গ্রাস করল মনকে। অসহায় নিগ্রোগুলোকে কারা এসে এমন নিষ্ঠুরভাবে খুন করে যাচ্ছে? কেন?

বাইরে বের করে আনার সময় বোধহয় ল্যাকোরের সার্জেন্ট দু'জনকে খেয়াল করেনি বুড়ো। এখন হঠাৎ ল্যাকোরের পেছনে ওদের দেখতে পেতেই আতঙ্কে চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসার জোগাড় হলো তার।

চকিতে ঘুরে দাঁড়ালাম। বিন্দুমাত্র ভাবান্তর নেই সার্জেন্টদের চেহারায়। শুধু ক্ষণিকের জন্যে দেখলাম ওদের দিকে চেয়ে ভয়ঙ্করভাবে জ্বলে উঠল ল্যাকোরের দুই চোখ।

বুড়ো লোকটির দিকে ফিরে দেখলাম এরই মধ্যে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তার নাড়ি দেখছেন ডাক্তার। মিনিটখানেক ধরে পরীক্ষা করে কুলিদের আদেশ দিলেন, তাকে

অন্য একটা ঘরে রেখে আসতে। আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'আশা নেই। আর ঘণ্টাখানেক বাঁচবে কিনা সন্দেহ, ছ'টা দিন যে কি করে টিকে ছিল! গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে।'

মনটা সাংঘাতিক খচখচ করতে লাগল আমার। অসংখ্য রহস্যের ভিড়ে এসে ঠাঁই নিয়েছে আরেক নতুন রহস্য। ল্যাকোরকে দেখে নির্বিকার ছিল বুড়ো, কিন্তু সার্জেন্ট দু'জনকে দেখামাত্র অমন আঁতকে উঠল কেন?

এই গাঁয়ে আর বিশ্রাম নিলাম না। সোজা এগিয়ে চললাম। পথে একটা বনের ধারে থেমে দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম। সন্ধে নাগাদ এসে পৌঁছলাম ছোট একটা গাঁয়ে, নাম কাদৌ। তাঁবু খাটানো হলো। দলের সবারই মুখচোখ গম্ভীর। কারও সঙ্গে কারও কথা নেই। সবার মনেই চাপা উত্তেজনা।

এখান থেকেই আমাদের সঙ্গ ছেড়ে যাবেন মিস জেন ব্লেজন আর সেন্ট বেরেন। তাঁরা যাবেন উত্তরে।

এই ভয়ঙ্কর অঞ্চলে মিস ব্লেজনকে শুধু কয়েকজন কুলি আর সেন্ট বেরেনের সঙ্গে ছেড়ে দিতে মন চাইল না আমাদের কারোই। অনেক বোঝালাম। কিন্তু কার কথা কে শোনে? যাবেনই মিস ব্লেজন। অনুমান করলাম, যদি বিয়ে হয় তবে এই একগুঁয়ে বৌ নিয়ে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হবে ক্যাপ্টেন মারসিনের।

শেষ পর্যন্ত এলাকাটার ভয়াবহতা সম্পর্কে মিস ব্লেজনকে একটু বুঝিয়ে বলতে বললাম ল্যাকোরকে। কিন্তু বলল না সে, বরং হাসল, রহস্যময় হাসি। লোকটার প্রতি ঘৃণায় আমার মন ছেয়ে গেল।

সকাল সকালই শুতে যাচ্ছি, লোকজন কম তাই বেশি তাঁবু খাটানোর ঝামেলা করিনি। এক তাঁবুতে দু'জন করে থাকার ব্যবস্থা করেছি। আজ আমার সঙ্গে থাকছেন ডক্টর চাতোন্নে।

শোয়ার আগে আমার বিছানায় এসে বসলেন ডাক্তার। ফিসফিস করে বললেন, 'একটা কথা জানিয়ে রাখছি আপনাকে, মঁসিয়ে ফ্লোরেন্স, লোকগুলো সাধারণ গুলিতে মরেনি। তাছাড়া বুড়োর কাঁধের ক্ষতটা দেখেছিলেন? বিস্ফোরক বুলেট!' বলেই আর একটিও কথা না বলে চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়লেন নিজের বিছানায়।

কি আর বলব? আরেক রহস্য এসে হাজির। এই অদ্ভুত বুলেট তৈরি করল কে এই এলাকায়? এতদিন পর্যন্ত শুধু শুনেই এসেছিলাম যে এমন বুলেট বানানো সম্ভব। কিন্তু তৈরি করে এই জিনিস ব্যবহার করতে শুরু করল, কোন সে প্রতিভাবান?

ফেব্রুয়ারি ১৮। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই আক্কেল গুড়ুম আমাদের সবার। উধাও হয়ে গেছে সৈন্যরা, বিশজন নিগ্রো সৈন্য, দু'জন সার্জেন্ট এমনকি ল্যাকোর পর্যন্ত। সেই সঙ্গে উধাও হয়েছে কুলির দল। রয়ে গেছে শুধু আমাদের নিজেদের কয়েকটা ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র, ছত্রিশটা গাধা আর পাঁচদিনের খাবার। গাইড টোনগানে পর্যন্ত উধাও।

ভয়ঙ্কর দুর্গম এলাকায় গভীর জঙ্গলের ধারে আমরা একেবারে অসহায় হয়ে পড়লাম।

এগারো

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল বারজাক মিশনের সদস্যরা। অনেক অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙলেন প্রথম আমিদী ফ্লোরেন্স। এরপরের করণীয় কি তাই নিয়ে আলোচনায় বসল সবাই।

হঠাৎ একটা তাঁবুর পাশের ঝোপের ভেতর থেকে গোঙানির আওয়াজ শোনা গেল। সচকিত হয়ে সেদিকে চাইল সবাই। আবার শোনা গেল গোঙানি। এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন ফ্লোরেন্স, ছুটলেন। তাঁর পেছনে পেছনে ছুটল অন্যেরা।

ঝোপের ভেতর পড়ে রয়েছে টোনগানে। হাত-পা-মুখ বাঁধা। পাঁজরার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে।

তাড়াতাড়ি ধরাধরি করে ঝোপের ভেতর থেকে বের করে আনা হলো টোনগানেকে। বাঁধন খোলা হলো। ডাক্তারী ব্যাগ নিয়ে এসেছেন ততক্ষণে ডক্টর চাতোন্নে। পাঁজরায় ব্যান্ডেজ বাঁধলেন, ইঞ্জেকশন দিলেন। একটু সুস্থ বোধ করতে লাগল টোনগানে, মুখ খুলল।

ভোররাতে নাকি একটা চাপা শব্দে ঘুম ভেঙে যায় টোনগানের। সাবধানে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে সে একে একে ঘোড়ায় চড়ে চলে যাচ্ছে নিগ্রো সৈন্যেরা, সার্জেন্ট দু'জন আছে সঙ্গে। একটু দূরে কুলিদের সঙ্গে হাত নেড়ে কি কথা বলছিল ল্যাকোর। মিনিট পাঁচেক পরেই তার সঙ্গে চলে যেতে শুরু করল কুলিরা। ব্যাপারটা কি ঘটছে বুঝতে পারেনি টোনগানে। চুপি চুপি এগিয়ে গিয়েছিল তদন্ত করতে। কিন্তু অতর্কিতে আক্রান্ত হয়। বাধা দেবার সময়ও পায়নি।

তিনজন সৈন্য মিলে বেঁধে ফেলে টোনগানেকে।

'ব্যাটা মরেছে তো?' জিজ্ঞেস করে ল্যাকোর।

'না, বেঁধেছি শুধু,' জবাব দিল একজন সার্জেন্ট।

'গর্দভ কোথাকার! এখনও জ্যান্ত রেখেছ কেন? ঢোকাও বেয়োনেট!' চাপা গলায় ধমকে উঠল ল্যাকোর।

সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করল সার্জেন্ট। মাটিতে পড়ে থাকা টোনগানের বুক লক্ষ্য করে নেমে এল বেয়োনেট। বুদ্ধি করে সঙ্গে সঙ্গে কাত হয়ে গেল টোনগানে, পাঁজরের চামড়া কেটে বসে গেল বেয়োনেট একপাশে, মোক্ষম জায়গায় লাগেনি। যেন হৃৎপিণ্ডে বিঁধেছে এমনি ভাবে গুঙিয়ে উঠল টোনগানে—ইচ্ছে করেই। আর সেজন্যেই বেঁচে গেল।

অন্ধকারে সার্জেন্ট ভাবল টোনগানে বুঝি মারা গেছে। ঠ্যাঙ ধরে টেনে তাকে ঝোপের ভেতরে ফেলে রেখে চলে গেল। রক্তক্ষরণে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল টোনগানে। একটু আগে হুঁশ হওয়ায় গোঙাতে পেরেছে।

মিশনের সবাই বুঝল, ক্যাপ্টেন মারসিনেকে কায়দা করে সরিয়েছে ল্যাকোর। কিন্তু কার আদেশে? ক্যাপ্টেন কি বেঁচে আছেন এখনও? প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা

জেন ব্লেজনের। কিন্তু বুঝিয়ে সুজিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন সেন্ট বেরেন।

এরপর পরিস্থিতির মোকাবিলা কিভাবে করা যায় তা নিয়ে আলোচনায় বসল অভিযাত্রীরা। প্রথমেই সঙ্গের জিনিসপত্রের হিসেব নিল। দেখা গেল, সাতটা রাইফেল, দশটা রিভলভার, প্রচুর কার্তুজ, সাতটা ঘোড়া, ছত্রিশটা গাধা, প্রায় হাজার পাউন্ড ব্যবহারের সামগ্রী আর চারদিনের মত খাবার আছে। সুতরাং ভেঙে পড়ার কোন কারণ নেই। চারদিনের খাবার তো আছেই, বন্দুকও আছে সঙ্গে; সুতরাং শিকার করে খাবার জোগাড় করতে কোন অসুবিধে হবে না।

কিন্তু গাধাগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে হয় আগে। এত গাধার কোন দরকার নেই এখন। তাছাড়া ওগুলোকে চালিয়ে নেয়াও এক সমস্যার ব্যাপার। দুটো গাধার পেছনে একজন করে লোক দরকার হয়।

বুদ্ধি দিলেন জেন। বিক্রি করে ফেলা হোক গাধাগুলোকে। কিন্তু এই জঙ্গলে গাধা কিনবে কে? কিনবে, জঙলীরা। কিন্তু ওদের কাছে পয়সা কোথায়? নাই বা থাকল, কড়ি তো আছে। ওই কড়ি হলে সামনের যে কোন গ্রাম থেকে খাবার কেনা যাবে।

সুতরাং জেন আর সেন্ট বেরেন গেলেন। কাদো গ্রামের লোকজনের সঙ্গে দামদর ঠিক করে বিক্রি করে ফেললেন গাধাগুলোকে। একবারে মন্দ দাম হলো না—সাড়ে তিন লাখ কড়ি।

গাধা তো বিক্রি হলো এখন মাল বয়ে নেয়া যায় কি করে? এরও সুরাহা করে ফেললেন জেন। গ্রাম থেকে ভাড়া করে কুলি নিয়ে এলেন। কড়ি দিয়েই ভাড়া মেটাবেন।

এসব করতে করতেই দিন তিনেক চলে গেল। এবারে রওনা দেয়া যায়, কিন্তু টোনগানে এখনও সেরে ওঠেনি। সে ভাল না হলে পথ দেখাবে কে? সুতরাং টোনগানে না সারা পর্যন্ত এখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল মিশনের সদস্যরা।

তেইশ তারিখ নাগাদ অনেকখানি সেরে এল টোনগানের পাঁজরার ঘা। পথ চলতে পারবে। সুতরাং আর দেরি করার কোন মানে হয় না।

সকাল সকালই মীটিং-এ বসল অভিযাত্রীরা। টোনগানে আর মালিকও থাকল মীটিঙে। সভাপতি অবশ্যই বারজাক।

চেম্বারে মীটিং শুরু করার আগে যেমন করে থাকেন তেমনি ভঙ্গিতে বললেন বারজাক, 'অধিবেশন শুরু হচ্ছে। কে আগে কথা বলবেন?'

বারজাকের কথার ধরনে হেসে উঠল সবাই—ফ্লোরেন্স ছাড়া। চেম্বার মীটিং দেখে দেখে অভ্যস্ত আছেন তিনি, কাজেই নাটুকেপনা আর হাসির উদ্রেক করে না তাঁর।

'আপনিই বলুন, মঁসিয়ে চেয়ারম্যান,' বললেন ফ্লোরেন্স।

'বেশ,' চেয়ারম্যান সম্বোধনে অবাক হলেন না বারজাক। মীটিংই তো এটা, আর এই মীটিঙে সভাপতি তো তিনিই। 'প্রথমেই দেখা যাক কোথায় আছি আমরা।' সামনের টেবিলে ফেলে রাখা ম্যাপের একটা জায়গায় আঙুল রেখে বললেন, 'সাগর উপকূল থেকে বহুদূরে, সুদানে আমাদের ফেলে পালিয়েছে

ল্যাকোর।'

সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে নোটবই বের করে নিলেন পর্সি। নাকের ওপর চশমাটা ঠিক করে বসিয়ে নিয়ে নোটবই খুলে বললেন, 'এক মিনিট, মঁসিয়ে চেয়ারম্যান। বহুদূর বলতে আমরা এখন সাগর থেকে আটশো আশি মাইল ন'শো আটত্রিশ গজ এক ফুট পৌনে পাঁচ ইঞ্চি দূরে আছি। এটা অবশ্য আমার তাঁবুর খুঁটি পর্যন্ত মাপ।'

'অত চুলচেরা হিসেবের দরকার নেই আমাদের, মঁসিয়ে পর্সি,' বললেন বারজাক। 'সোজা কথা, কোনাক্রি থেকে এখন ন'শো মাইলের মত দূরে আছি আমরা। তাড়াতাড়ি কাছাকাছি কোন ফরাসী সৈন্য ছাউনিতে পৌঁছনো দরকার, এবং যদ্দূর তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

বারজাকের কথায় সায় দিল সবাই। কেবল মুখ গোমড়া করে রইলেন পর্সি। জবাব দিলেন না।

'তা, সায়ে গেলে কেমন হয়?' প্রস্তাব রাখলেন বারজাক, 'নাইজারের মধ্যেই পড়েছে জায়গাটা।'

'অনেক অসুবিধে তাতে,' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন পর্সি। ঝড়ের গতিতে উল্টে গেলেন নোটবইয়ের পাতা। 'সায় এখান থেকে পাঁচশো মাইল দূরে। আমাদের গড়পড়তা পদক্ষেপ পঁচিশ ইঞ্চি। তাহলে পাঁচশো মাইল যেতে পা ফেলতে হবে এক লক্ষ এগারো হাজার একশো এগারো বার। সোজা কথা?'

'খামোকা বাজে কথা বলছেন,' খেপেই গেলেন ফ্লোরেন্স। 'অত অঙ্ক না শুনিয়ে সোজা বললেই হয়, দিনে দশ মাইল চলতে পারলে সময় লাগবে মোট তিপান্ন দিন।'

'অন্য কারণে বলছি হিসেবটা,' নোটবই বন্ধ করে বললেন পর্সি, 'সায়ে না গিয়ে জেন-এ যাওয়া উচিত আমাদের। অর্ধেক পথ। পাঁচশোর জায়গায় মাত্র আড়াইশো মাইল।'

'এর চেয়ে ভাল সিগৌসিকোরো চলুন না, মাত্র একশো মাইল?'

'এরচেয়ে ভাল হয় যদি আবার সিকাসোতে ফিরে যাই আমরা। একশো কুড়ি মাইল। কুড়ি মাইল বেশি বটে, কিন্তু চেনাজানা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, সাহায্য পাওয়া যাবে। আর তা না হলে মঁসিয়ে ফ্লোরেন্সের কথামত সিগৌসিকোরোতেই যাওয়া যাক।'

'ঠিকই বলেছেন আপনি,' বললেন বারজাক। 'আর মঁসিয়ে ফ্লোরেন্সও মন্দ বলেননি। সিকাসো ফিরে গেলেই বেশি ভাল হত আমাদের, কিন্তু লোকে যে দূর দূর করবে। বলবে, অভিযান ভণ্ডুল করে ফিরে এসেছে বোকা পাঁঠাগুলো। ভদ্রমহোদয়গণ,' বক্তৃতা শুরু করতে গেলেন তিনি আবার, 'কর্তব্য সবার আছে…'

বারজাককে এখুনি বাধা দেয়া দরকার, বুঝলেন ফ্লোরেন্স। নইলে পরে তাঁর বক্তৃতা থামানোই কঠিন হবে। তাই তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'কিন্তু কর্তব্যের চাইতে বড় হলো বিচক্ষণতা।'

'কিন্তু সত্যিই কি কোন বিপদ আছে সামনে?' প্রশ্ন রাখলেন বারজাক, 'এর আগেও আমাকে বলেছেন মঁসিয়ে ফ্লোরেন্স। কোন এক অদৃশ্য শত্রু পিছু লেগেছে

আমাদের। কিন্তু ওরা তো শুধু আমাদের ভয় দেখিয়েই ক্ষান্ত থেকেছে, সত্যিকারের কোন ক্ষতি করতে পারেনি।'

'টোনগানেকে তো মারতেই চেয়েছিল,' বললেন ডক্টর চাতোন্নে।

'ও তো নিগ্রো, ওর আবার প্রাণের দাম কি?'

'ভুলে যাচ্ছেন কেন, মঁসিয়ে চেয়ারম্যান,' ছাড়ার পাত্র নন ডাক্তার, 'এই নিগ্রোদের ভোটাধিকার দানের জন্যেই দেশ থেকে বেরিয়েছেন আপনি। আমাদেরকেও এই বিপদের মুখে টেনে এনেছেন। এখন এ ধরনের কথা অন্তত আপনার মুখে মানায় না। তাছাড়া শুধু টোনগানেকে কেন, এর আগে আমাদেরকেও তো বিষ খাইয়ে মারার পরিকল্পনা করেছিল শত্রুরা।'

'ঠিকই বলেছেন, ডক্টর,' সায় দিলেন ফ্লোরেন্স।

কয়েক মিনিট নীরবতা। ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন বারজাক।

'ঠিক আছে,' শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে নিয়ে বললেন বারজাক, 'আপনাদের দু'জনের প্রস্তাবকেই ভোট দিচ্ছি; সিকাসোতে যাব, না সিগৌসিকোরো। কেউ যদি বলেই যে, অভিযান ভণ্ডুল করে ফিরে এসেছি আমরা তবে সোজা মুখের ওপর বলে দেব যে, দোষ আমাদের নয়, দোষ সরকারের। আমাদের নিরাপত্তা প্রদান করতে পারেনি সরকার। সশস্ত্র প্রহরী দিয়ে তা আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।'

'একেই বলে পলিটিক্যাল লীডার,' বিড় বিড় করে বললেন পর্সি। 'কোন ব্যাপারেই সহজে হারতে রাজি নন এঁরা।'

হঠাৎই ব্যাপারটা খেয়াল হলো ফ্লোরেন্সের। চুপচাপ বসে শুধু শুনছিল খালা-বোনপো। একটা কথাও বলেনি মীটিঙে। ওঁদের মতামতও তো নেয়া দরকার। তাই বলে উঠলেন, 'মিস ব্লেজন আর মঁসিয়ে বেরেনের মতামত তো শুনিনি আমরা এখনও।'

'ঠিক, ঠিক কথা!' প্রায় লাফিয়ে উঠলেন বারজাক।

ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল জেন ব্লেজন, শান্ত স্বরে বলল, 'আমাদের মতামতের কোন দরকার নেই। কারণ আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি না আমরা দু'জন। কিন্তু যেখানে যাব বলে বেরিয়েছি, প্রাণ থাকতে তার শেষ না দেখে ছাড়ব না।'

'অ্যাঁ!' চমকে উঠলেন যেন বারজাক, 'কিন্তু সঙ্গে সৈন্যসামন্ত যে কেউ নেই।'

'থাকবে না ধরে নিয়েই তো বেরিয়েছিলাম।'

'কিন্তু কুলি?'

'কুলি পথে নিয়ে নেব। তাছাড়া কয়েকজন তো ঠিকই করে রেখেছি।'

'অদৃশ্য শত্রু…।'

'তার রাগ আপনাদের ওপর, আমার ওপর নয়।'

হঠাৎই রেগে গেলেন বারজাক, 'তাহলে গায়ের জোরে আটকাব আপনাকে। ইয়ার্কি পেয়েছেন? আমি চেম্বারের একজন মেম্বার সামনে থাকতে কোন অস্থানে কুস্থানে গিয়ে মরবেন আপনি, আর তাই আমি বসে বসে দেখব ভেবেছেন?'

'আমি বালিকা নই,' শান্ত স্বরেই বলল জেন। 'আর ইয়ার্কিও মারছি না।'

'তবে?'

'তবে আবার কি, কর্তব্য।'

'কর্তব্য!' বিমূঢ় হয়ে গেলেন বারজাক। মিশনের অন্য সদস্যরাও বিস্মিত : এই গভীর জঙ্গলে কি কর্তব্য থাকতে পারে একটা মেয়ের?

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল জেন। তারপর মনস্থির করে নিয়ে বলল, 'প্রথম থেকেই আপনাদের ঠকিয়েছি আমি, সেজন্যে মাপ চাইছি আজ।'

'ঠকিয়েছেন।' বিস্ময়ে ভুরু কুঁচকে গেছে বারজাকের।

'হ্যাঁ, ঠকিয়েছি। সেন্ট বেরেন সত্যিই ফরাসী, কিন্তু আমি ইংরেজের মেয়ে। আমাকে আপনারা কেউই ঠিক চিনে উঠতে পারেননি। আমার নাম জেন ব্লেজন। ইংল্যান্ডের লর্ড ব্লেজন আমার বাবা। বড় ভাই ছিলেন ক্যাপ্টেন জর্জ ব্লেজন। কৌবোর কাছে কোন এক অজ্ঞাত কবরে শুয়ে আছেন এখন, সুতরাং কৌবো পর্যন্ত যেতেই হবে আমাকে। এটা আমার কর্তব্য।'

একে একে আফ্রিকা অভিযানের আসল উদ্দেশ্য বলে গেল জেন ব্লেজন। আবেগে গলা কাঁপছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ হয়ে বসে তার কথা শুনছে শ্রোতারা। বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে, ভাইয়ের বদনাম ঘোচাতে, বাপের সুনাম রাখতে দুর্গম যাত্রায় বেরিয়েছে একরত্তি একটা মেয়ে, এ যে অবিশ্বাস্য!

হঠাৎ প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়লেন আমিদী ফ্লোরেন্স, 'মিস ব্লেজন, আপনার বিরুদ্ধে নালিশ আছে আমার!'

হকচকিয়ে গেল জেন। ফ্লোরেন্সের এ-রকম প্রতিক্রিয়া আশা করেনি সে।

'নালিশ?'

'হ্যাঁ, নালিশ। ভুলে যাচ্ছেন কেন, জাতে আমি ফরাসী।'

'তো, তো কি হয়েছে?' কথা জড়িয়ে গেল জেনের।

'ছিঃ ছিঃ! কি করে ভাবলেন আপনি, আপনাকে আমরা বিপজ্জনক একটা জায়গায় যেতে দেব? একা?'

'মঁসিয়ে ফ্লোরেন্স!' তবু ঠিক বুঝতে পারছে না জেন।

'অন্যায়। এ ঘোর অন্যায়। আসলে অত্যন্ত স্বার্থপর আপনি...'

বুঝে ফেলল জেন। হাসল, 'বুঝেছি, মঁসিয়ে ফ্লোরেন্স।'

'কথা বলতে দিন আমাকে,' তীব্র গলায় বললেন ফ্লোরেন্স। 'জাতে শুধু ফরাসীই নই, জাতে আমি সাংবাদিকও। প্যারিসে বসে অদ্ভুত সব খবরের আশায় প্রহর গুনছেন আমার সম্পাদক। যখন শুনবেন যে, জেন ব্লেজনের গরম খবর আমার নাকের ডগা দিয়ে পালিয়েছে, আর আমি বসে বসে শুধু হাই তুলেছি তখন চাকরিটা রাখবেন? তাছাড়া অ্যাডভেঞ্চারের নেশাও আমার আছে। সুতরাং, বুঝতেই পারছেন, আপনার সঙ্গে যাচ্ছি আমি।'

'মঁসিয়ে ফ্লোরেন্স!'

'হ্যাঁ, তাই।' একগুঁয়ের মত বললেন ফ্লোরেন্স, 'বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না, আমি যাচ্ছি।'

এগিয়ে এসে ফ্লোরেন্সের হাত চেপে ধরল জেন। ছলছল করে উঠল দুই চোখ, 'সত্যি আমার সৌভাগ্য, মঁসিয়ে ফ্লোরেন্স।'

'আর আমি?' গম্ভীর গলায় জানতে চাইলেন ডক্টর চাতোন্নে, 'আমাকে নেবেন না?'

'আপনি?' ঘুরে চাইল জেন।

'হ্যাঁ, আমি। এরকম অভিযানে ডাক্তার একজন সঙ্গে থাকতেই হবে। ধরুন জঙলীরা আপনাকে শরীরের মাঝামাঝি থেকে কেটে দু'টুকরো করে ফেলল। তখন সেলাই করে জোড়া লাগাবে কে, শুনি?'

ডাক্তারের কথার ধরন শুনে হেসে ফেললেন ফ্লোরেন্স। কিন্তু ফুঁপিয়ে উঠল জেন, 'ডক্টর! ডক্টর!'

ওদিকে খেপে লাল হয়ে গেছেন বারজাক। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ভেবেছেন কি আপনারা, মিস ব্লেজন? ফ্লোরেন্স? ডক্টর? আমার মতামতটা নেবারও প্রয়োজন নেই নাকি আপনাদের?'

সত্যিই রেগেছেন বারজাক। কেউ কোন কথা বলল না।

'ডক্টর চাতোন্নে,' আবার বললেন বারজাক, 'আপনি এই মিশনের সদস্য, কিন্তু আমি লীডার। আমার হুকুম না নিয়ে এই বিদেশিনীকে কথা দিচ্ছেন কি করে?'

'আমি, মানে আমি...' আমতা আমতা করতে লাগলেন ডাক্তার।

'হ্যাঁ, আপনি। আমাকে জিজ্ঞেস না করে কি করে কথা দিচ্ছেন?'

'আমি...আমি...'

বসে ছিলেন, লাফ মেরে উঠে দাঁড়ালেন বারজাক, 'ভয়ানক জঙলী এলাকা দিয়ে অগুনতি বিপদের মোকাবিলা করে এগোতে হবে মিস ব্লেজনকে।' হঠাৎ কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে নিলেন তিনি, 'তাই আমার মনে হয়, মিশনের সবার উচিত একজন বিদেশিনীকে একান্তভাবে সাহায্য করা। অর্থাৎ আমাকেও বাধ্য হয়েই যেতে হচ্ছে।' ঘুরিয়ে কথাটা বললেন বারজাক।

'মঁসিয়ে বারজাক!' এবারে কেঁদেই ফেলল জেন।

এক মুহূর্তে গম্ভীর ভাব দূর হয়ে গেল সবার মুখ থেকে। সমানে কথা বলতে লাগলেন সবাই।

'সামান্য একটুখানি রাস্তা, খাবারের অভাব হবে না,' বললেন ফ্লোরেন্স।

'চার পাঁচদিনের খাবার তো সঙ্গেই রয়েছে।' এমনভাবে বললেন ডাক্তার যেন ছ'মাসের খাবার আছে।

'পাঁচদিন নয়, ঠিক চারদিনেরই আছে,' সঠিক পরিমাণ বাতলে দিলেন বারজাক। তারপর বললেন, 'কিন্তু তাতে কি, পথে কিনে নেব।' কথাটা এমন ভাবে বললেন যেন প্যারিস, বাড়ির বাইরে গেলেই খাবারের দোকান।

'আর শিকার তো রয়েইছে,' বললেন ডাক্তার।

সেন্ট বেরেন বললেন, 'মাছ ধরা তো আরও সোজা।'

ডাক্তার বললেন, 'জঙলী ফলও প্রচুর মিলবে।'

উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল টোনগানে, বলল, 'গাছ চেনা আছে আমার।'

'সি মাখন বানাতে পারি আমি। সত্যি!' বলে আনন্দে প্রায় নাচতে লাগল মালিক।

'হিপ, হিপ, হুররে! হিপ, হিপ, হুররে!' লাফিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন ফ্লোরেন্স।

'তাহলে আর সময় নষ্ট না করে কাল ভোরেই রওনা দেয়া যাক,' প্রস্তাব

রাখলেন বারজাক।

এতক্ষণ একটাও কথা বলেননি পর্সি। নোটবই খুলে আপন মনে অঙ্ক কষছিলেন এত গোলমালের মাঝেও। হঠাৎ মুখ তুলে চেয়ে বললেন, 'তার মানে সিগৌসিকোরোর চাইতে আরও আড়াইশো মাইল বেশি যেতে হচ্ছে আমাদের। প্রতিবার পা ফেলে যদি পঁচিশ ইঞ্চি যাই আমরা···।'

কেউ কান দিল না গণিত বিশারদের কথায়।

বারো

কাদৌ গ্রামের মোড়লের সাহায্যে জোগাড় করা ছয় জন কুলির পিঠে মালপত্র চাপিয়ে চব্বিশে ফেব্রুয়ারি আবার যাত্রা করল বারজাক মিশন। সবার মুখে হাসি। কিন্তু পর্সি মুখ ভার করেই রেখেছেন। সত্যিই গণিত বিশারদের মতিগতি বোঝা ভার।

মালিককে নিজের ঘোড়ায় তুলে নিয়েছে টোনগানে। দেখে মুখ টিপে হাসছে অন্যেরা।

অবাধ্য হতচ্ছাড়া গাধাগুলো সঙ্গে নেই। হিসেব করে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো শুধু সঙ্গে নেয়া হয়েছে। বাকি জিনিসপত্র গাঁয়ের মোড়লকে উপহার দিয়ে দিয়েছেন বারজাক। জেনের জন্যে মাত্র একটা তাঁবু সঙ্গে নিয়ে বাকি তাঁবুগুলোও মোড়লকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং অভিযাত্রীদের জন্যে আন্তরিক ভাবেই খেটেছে মোড়ল।

বোঝা কম। দ্রুত চলে দশ থেকে পনেরোই মার্চ নাগাদ কৌবো পৌঁছার আশা করছে অভিযাত্রীরা।

পাঁচদিনেই নব্বুই মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ফেলল তারা। এ-পর্যন্ত এসে সানাবো গ্রাম থেকে খাবার পাওয়া গেল। এর আগে পর্যন্ত শিকার করেই খাওয়া হয়েছে। সঙ্গের খাবারে তেমন একটা হাত পড়েনি। রাতে খোলা আকাশের নিচে কম্বলমুড়ি দিয়ে ঘুমিয়েছে পুরুষেরা। একমাত্র জেন তাঁবুতে।

মার্চ ২। সেন্ট বেরেনের পাশাপাশি ঘোড়ায় চেপে চলেছেন ফ্লোরেন্স। সকাল থেকে হোঁচট খাচ্ছিল তাঁর ঘোড়াটা। কারণটা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। আচমকাই এক জায়গায় এসে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল; পিঠ থেকে ছিটকে দশ হাত দূরে গিয়ে পড়লেন ফ্লোরেন্স।

তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে এল সবাই। কিন্তু তার আগেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লেন ফ্লোরেন্স। ঘোড়াটাকে বাঁচানো গেল না, ব্যর্থ চেষ্টা করলেন ডাক্তার।

টোনগানে তার ঘোড়াটা ফ্লোরেন্সকে দান করে দিল। মালিককে নিজের ঘোড়ায় তুলে নিল জেন।

রাতে একটা টিলার নিচে ঝোপের ধারে আশ্রয় নিল সবাই। টিলার উপরে

উঠলে চার দিকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। উঠে দেখে এসেছেন ফ্লোরেন্স। একটা জিনিস নজর এড়ায়নি তাঁর। তাঁদের কয়েক দিন আগে ঘোড়সওয়ারের একটা দল জিরেন দিয়ে গেছে এখানে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা প্রচুর চিহ্ন এখন পরিষ্কার বর্তমান।

কারা তারা? অবাক হলেন ফ্লোরেন্স। নিগ্রো, না সাদা মানুষ? সাদা মানুষই হবে। কারণ নিগ্রোরা পারতপক্ষে ঘোড়ায় চড়ে না। শেষ পর্যন্ত একটা তুচ্ছ জিনিস কুড়িয়ে পেয়ে স্থির নিশ্চিত হলেন ফ্লোরেন্স যে সাদা মানুষই। জিনিসটা হলো একটা বোতাম। এই বোতাম নিগ্রোরা লাগাবে না।

ডেকে দলের সবার দৃষ্টিগোচর করলেন ব্যাপারটা ফ্লোরেন্স। চিন্তিত হলো সকলেই।

উত্তর-পুবে সোজা এগিয়ে চলেছে বারজাক মিশন। এই একই পথে গিয়েছে আগের ঘোড়সওয়ার দলটাও। পথে পথে প্রচুর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

ফ্লোরেন্সের ঘোড়ার মতই আচমকা বারজাকের ঘোড়াটাও মুখ থুবড়ে পড়ল চৌঠা মার্চ।

মরে গেল, যদিও আন্তরিক চেষ্টা চালালেন ডাক্তার।

এ কি কাণ্ড!

এবারে মরা ঘোড়াটাকে ভাল করে পরীক্ষা করলেন ডাক্তার। ফ্লোরেন্সকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'সাবধানে থাকবেন!'

'কেন?' অবাক হলেন ফ্লোরেন্স।

'দুটো ঘোড়াই বিষ খেয়ে মরেছে।'

'তা কি করে সম্ভব? কে বিষ খাওয়াবে ঘোড়াকে?'

'তা জানি না। তবে ঘোড়াকে যখন খাওয়াচ্ছে, মানুষকেও খাওয়াতে পারে। তাই বলছি, সাবধান।'

'কি করা যায় এখন?' চিন্তিতভাবে বললেন ফ্লোরেন্স।

'মিস ব্লেজনকে ছাড়া সবাইকে জানিয়ে রাখুন। মেয়েটাকে ভয় পাইয়ে কোন লাভ হবে না।'

'বিষাক্ত আগাছাও তো খেতে পারে ঘোড়া দুটো?'

'তা সম্ভব নয়। আসলে ওদের খাবারে কেউ বিষ মিশিয়ে দিয়েছে।'

এরপর থেকে চোখে চোখে রাখা হলো বাকি পাঁচটা ঘোড়াকে। পরের দু'দিন তেমন কিছুই ঘটল না। পথে আরেকটা গ্রাম থেকে খাবার জোগাড় করা গেল। সঙ্গের রসদ এখনও প্রায় অটুটই রয়েছে।

তারপরের দিন দুপুরে কিন্তু খাবারে হাত দিতে হলো। এর আগের গ্রাম থেকে জোগাড় করা খাবারে মাত্র দু'বেলা চলেছে। শিকার মিলছে না এদিকে। নদী-ডোবা কিছুই নেই যে মাছ ধরবেন বেরেন। কয়েকটা ব্যাঙ ধরে এনেছিলেন অবশ্য, কিন্তু অতি বিষাক্ত জাতের ব্যাঙ বলে ফেলে দিয়েছে টোনগানে।

ছয় তারিখে বিকেলের দিকে দূর থেকে একটা শহর চোখে পড়ল। কিন্তু ধারে কাছে ঘেঁষা গেল না। অভিযাত্রীরা আধমাইল দূরে থাকতেই গর্জে উঠল একটার পর একটা ফ্লিন্ট বন্দুক। বিকট রণহুঙ্কার ছেড়ে নগরের ভেতর থেকে দলে দলে বেরিয়ে

এল কাফ্রীরা। আজব ব্যাপার! অত বন্দুক কোথায় পেল অসভ্যরা? সাদা পতাকা ওড়াল অভিযাত্রীরা। কিন্তু অসভ্যরা এর মর্ম বুঝলে তো! অল্পের জন্যে গুলি থেকে বেঁচে গেল পতাকাধারী।

কাজেই ঝামেলা না বাড়িয়ে দূর দিয়ে নগর এড়িয়ে গেল অভিযাত্রীরা।

কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারের অর্থ বোঝা গেল না।

মার্চ ৭। কাদৌ থেকে রওনা দেবার পর প্রায় দু'শো মাইল পাড়ি দিয়েছে বারজাক মিশন। এখনও অনেক পথ বাকি, প্রায় অর্ধেক। সামনে কোন গাঁয়ে খাবার না পাওয়া গেলে মুশকিল হবে।

কিন্তু সারাটা দিনেও কোন গাঁয়ের ছায়া চোখে পড়ল না। এদিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মারা গেছে আরেকটা ঘোড়া।

'এত তীক্ষ্ণ নজর রাখছি, তবু বিষ খাওয়ানো বন্ধ হলো না,' বললেন ফ্লোরেন্স।

'মনে হয় নতুন করে খাওয়ানো হচ্ছে না,' চিন্তিতভাবে বললেন ডাক্তার। 'কে জানে, কাদৌতেই হয়তো ডোঔং খাওয়ানো হয়েছে ঘোড়াগুলোকে। সব ঘোড়ার সহ্য ক্ষমতা সমান নয়, তাই আগে-পিছে মারা যাচ্ছে।'

মার্চ ৮। ফুরিয়ে এসেছে সঙ্গের খাবার। বড়জোর আর একদিন চলবে। বিকেল নাগাদ কোন গ্রামে খাবার না পাওয়া গেলে উপোস থাকতে হবে।

যাত্রার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দূরে একটা গ্রাম দেখা গেল। নতুন উদ্যমে এগিয়ে চলল অভিযাত্রীরা। কিন্তু গ্রামের কাছে এসে হতাশ হতে হলো। একেবারে খাঁ খাঁ করছে গ্রাম। নীরব, নিস্তব্ধ। জনমানুষের চিহ্ন নেই।

ঘন ঘাসের পুরু কার্পেটের সোজা রাস্তা গিয়ে ঢুকেছে গাঁয়ে। রাস্তার ওপর কালো কালো দাগ। রক্তের দাগের মত।

দ্বিধা করলেন বারজাক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলের সবাইকে গ্রামে ঢোকার আদেশ দিলেন, গিয়ে দেখাই যাক না কি ঘটেছে।

আগে গেলেন ফ্লোরেন্স আর ডাক্তার।

গাঁয়ে ঢুকতেই বিশ্রী পচা দুর্গন্ধ এসে ঝাপটা মারল নাকে। আরও কয়েক গজ এগোতেই বোঝা গেল কারণটা। পচে ফুলে ঢোল হয়ে আছে একটা লাশ। মানুষের। তার গজ কয়েক পরেই আরও দশজন নিগ্রো। প্রথম লাশটারই মত অবস্থা।

নাকে রুমাল বেঁধে এগিয়ে গিয়ে একটা লাশ পরীক্ষা করে দেখলেন ডাক্তার। ফিরে এসে গম্ভীর গলায় জানালেন, 'পিঠ ফুঁড়ে ঢুকেছে গুলি। কিন্তু বেরোয়নি। উল্টো দিকে চাপ দিয়ে বুঝলাম, বুকের ভেতরটা চুরমার হয়ে গেছে। সেই বিস্ফোরক বুলেট।'

'আবার!' শিউরে উঠলেন ফ্লোরেন্স।

'হ্যাঁ। আবার।'

স্তব্ধ হয়ে গেলেন ফ্লোরেন্স। ভয়ানক দুশ্চিন্তার ছাপ ডাক্তারের মুখেও। অন্যেরাও এগিয়ে এসেছে ততক্ষণে। সবাই জানতে চাইছে, ব্যাপার কি? তুমুল লড়াইয়ের চিহ্ন চারদিকে বর্তমান। প্রাণপণে লড়াই করেছে নিগ্রো গ্রামবাসীরা, কিন্তু ভয়াবহ অস্ত্রের ঘায়ে অসহায়ভাবে প্রাণ দিয়েছে শুধু। তাদের তীর বল্লম কোন

কাজেই আসেনি।

'দশদিন আগে মারা গেছে হতভাগ্য লোকগুলো,' ঘোষণা করলেন ডাক্তার।

'কিন্তু কারা এই নিষ্ঠুর হানাদার?' জানতে চাইলেন সেন্ট বেরেন।

'গত ক'দিন ধরেই যাদের এগিয়ে যাবার চিহ্ন দেখেছি আমরা,' একটু থেমে বললেন ডাক্তার, 'আসলে এরাই নগরের অসভ্যদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে। আমাদের পরিচিতই হয়তো। তাই বাইরে বেরিয়ে আসেনি। কায়দা করে কিংবা ভয় দেখিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে দিয়েছে অসভ্যদের।'

'কিন্তু অত কিছু না করে সোজা আমাদের খুন করে ফেললেই হয়?'

'নিশ্চয়ই গভীরে কোন রহস্য আছে। হয়তো আমাদের মারতে চায় না ওরা।'

'কেন?'

'তা তো জানি না।'

'কিন্তু খুনেদের অত কাছে থাকা কি আমাদের জন্যে নিরাপদ?'

'ওরা আমাদের ক্ষতি করতে চাইলে দূরে থেকেও নিরাপদ নই।'

খাবারের জন্যে গ্রামটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল অভিযাত্রীরা। কিন্তু কোন খাবার নেই। দেখা গেল, ইচ্ছে করেই নষ্ট করে ফেলা হয়েছে সব।

খোলা আকাশের নিচে আধপেটা খেয়ে রাত কাটাল পুরুষেরা, জেন তাঁবুতে। অল্প অল্প খেয়ে জমিয়ে রাখা খাবারে আর এক বেলা চলবে। কিন্তু তারপর?

মার্চ ৯। দুটো গ্রাম পড়ল পথে। কিন্তু পেছনে ফেলে আসা শহরের কাফ্রীদের মত দুটো গ্রামের লোকজনই অস্ত্র নিয়ে তেড়ে এল। অনুমান করলেন ডাক্তার, যেসব গ্রামের লোক শ্বেতাঙ্গদের কথা শোনেনি তাদেরই জান দিতে হয়েছে। তৃতীয় আরেকটা গ্রামের কাছে যেতে কোন নিগ্রো তেড়ে এল না। গ্রামে ঢুকতে শুধু মরা মানুষের লাশ দেখা গেল, খাবারদাবার সবই নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।

'ইচ্ছে করেই আমাদের উপোস করিয়ে রাখছে হারামজাদারা। মাঝে থেকে প্রাণ দিচ্ছে কতগুলো নিরপরাধ মানুষ,' ফুঁসে উঠে বললেন বারজাক।

'আর তো মোটে একশো মাইল,' জোর করে মুখে হাসি টেনে বললেন ফ্লোরেন্স। 'পথে শিকার পাওয়া যাবেই। দেখছেন না, সামনে জঙ্গল?'

জঙ্গল ঠিকই, লম্বা ঘাসবনও আছে। কিন্তু শিকার পাওয়া গেল না বললেই চলে। আগেই হানা দেয়া হয়ে গেছে জঙ্গলে। অসংখ্য মৃত প্রাণীর লাশ দেখে তা বোঝা গেল। বাকি জানোয়ারগুলো ভয়ে জঙ্গল ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু তবু একেবারে হতাশ হতে হলো না অভিযাত্রীদের। সারাদিনের চেষ্টায় দুটো তিতির, দুটো গিনি ফাউল আর একটা বাস্টার্ড পাখি পাওয়া গেল। খুবই সামান্য, চোদ্দটা পেটের জন্যে কিছুই নয়, কিন্তু তবু তো খাবার।

জঙ্গলের ওপাশে বেরিয়ে এসে রাত কাটানোর ব্যবস্থা হলো। অগ্রগামী ঘোড়সওয়ার দলটা অনেক চিহ্ন রেখে গেছে আশেপাশে। দুই দলের মধ্যে আর খুব একটা ব্যবধান বোধ হয় নেই।

হঠাৎ টোনগানের চিৎকার শোনা গেল। সবাই ছুটোছুটি করে এগিয়ে গেল তার কাছে। কি ব্যাপার? চারটে ঘোড়ার দুটো হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে মাটিতে।

এক ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেল ঘোড়া দুটো।

বাকি দুটো ঘোড়াও মারা গেল মার্চের দশ তারিখে।

ঘোড়া নেই, খাবার নেই। ওদিকে সকালে উঠে দেখা গেল কেটে পড়েছে ছয় জন কুলি।

মন ভেঙে গেল এবার বারজাক মিশনের সবারই। জেন ব্লেজনের অবস্থাই সব চেয়ে কাহিল। বারবার নিজেকে দোষারোপ করছে সে। তার একগুঁয়েমির জন্যেই এতগুলো লোক অসহায়ভাবে মরতে বসেছে। বুঝিয়ে সুজিয়ে শান্ত করা হলো তাকে। কিন্তু এদিকে পেট তো মানে না।

কুলিরা পালিয়েছে, মালপত্র বয়ে নেবে কে? তাই ওগুলো ফেলে রেখেই এগিয়ে চলল সবাই। এগারো তারিখ গেল, খাবার মিলল না।

মার্চ ১২। আরেকটা গ্রাম পেরিয়ে গেল অভিযাত্রীরা। কিন্তু খাবার মিলল না এখানেও। উঠান ভর্তি পড়ে আছে মানুষের লাশ। সব ক'টা কুঁড়েঘর পোড়ানো। সদ্য পোড়ানোর চিহ্ন।

ভয় পেল অভিযাত্রীরা। আস্তে আস্তে কাছে আসছে খুনে দলটা।

কিন্তু ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। বরং সামনে এগোনোই নিরাপদ, ছাউনি আর বেশি দূরে নয়। নাইজার পর্যন্ত কোনমতে টিকতে পারলে বেঁচে যাওয়া যাবে এ যাত্রা।

কিন্তু এগোনো যায় কি করে? খাবার তো পাওয়া যাচ্ছে না। কোন গাঁয়ের কাছাকাছি হলেই হয় তেড়ে আসছে নিগ্রোরা, কিংবা দেখা যাচ্ছে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, মানুষ খুন করে ছারখার করে ফেলা হয়েছে। পথে নদী পড়ছে না এখন। জঙলীদের কুয়োগুলোও নষ্ট করে রাখা হচ্ছে। খাবার তো দূরের কথা, পানিও মিলছে না এখন আর।

শরীর ক্রমেই কাহিল হয়ে পড়ছে, কিন্তু মনোবলে চিড় ধরতে দিচ্ছে না বারজাক মিশনের কেউ। আফ্রিকার ভয়ঙ্কর রোদে পুড়ে তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে, পেটে অসহ্য খিদে নিয়েই একটু একটু করে উত্তরে এগিয়ে চলেছে অভিযাত্রীরা।

সবাইকে ছাড়িয়ে গেল মালিক আর টোনগানের সহ্যশক্তি।

খেপে আগুন হয়ে আছেন বারজাক। ক্রমাগত সরকারের মুণ্ডুপাত করছেন। বার বার হলপ করছেন, একবার দেশে ফিরতে পারলে হয়, সরকারকে গদিছাড়া করে নতুন সরকার গঠনের ব্যবস্থা করবেন।

আশ্চর্য। সারাক্ষণই হাসি আনন্দে সবাইকে মাতিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন ডক্টর চাতোন্নে।

মাঝেমধ্যে অতি সামান্য ফলমূল জোগাড় করে দিতে লাগল টোনগানে। কিন্তু তাতে খিদের কিছুই হলো না, বরং আরও বেশি করে চেগিয়ে উঠল।

হাসেন না, কথা বলেন না, গজগজ করেন না কেবল একজন। সুযোগ পেলেই ইনি নোটবই খুলে অঙ্কের নেশায় পড়ে থাকেন। গণিত বিশারদ পর্সি।

কোথায় আছেন, চারদিকের অবস্থা কি, সেসবের খেয়ালই নেই সেন্ট বেরেনের। নদী নেই। মাছ ধরবেন কোথা থেকে? তাই বড়শিতে গেঁথে সাপ-গিরগিটি যা খুশি ধরছেন। সবই অখাদ্য।

একেবারে চুপ হয়ে গেছে জেন ব্লেজন। অতিরিক্ত পথশ্রম, খিদের জ্বালা, তার

ওপর এতগুলো লোককে বিপদের মধ্যে টেনে আনার অনুশোচনায় জ্বলে পুড়ে মরছে। দিন যাচ্ছে, আর ক্রমেই আরও বেশি কাহিল হয়ে পড়ছে শরীর। কিন্তু মনোবল ভাঙতে দিচ্ছে না। যাবেই সে কৌবো পর্যন্ত। কি আছে না দেখে ছাড়বে না।

একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারছেন না ফ্লোরেন্স। খুন তাঁরা হবেনই তবে হয়তো এখন নয়, আরও কিছুদিন পরে। যে মুহূর্তে মিশন শেষ হবে তখন। আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করছেন তিনি গত দু'দিন ধরে; আশে পাশে অদৃশ্য থেকে সারাক্ষণ তাঁদের ওপর কারা যেন নজর রাখছে।

সন্দেহটা আরও দৃঢ় হলো বারোই মার্চ তারিখে, একটা গ্রাম পেরিয়ে আসার পর। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে মানুষ খুন করা হয়েছে সে গ্রামে, কুঁড়েঘর জ্বালানো হয়েছে।

এদিনই রাতের অন্ধকারে পরিষ্কার ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পান ফ্লোরেন্স। এগিয়ে এল সে শব্দ। ঘণ্টাখানেক পরেই আশেপাশের ঘাসবন আর ঝোপঝাড়ে সড়সড় শব্দ হতে লাগল। লুকিয়ে পড়ছে কারা যেন।

টোনগানেও চুপিচুপি জানাল, জঙ্গলে ছায়ামূর্তি দেখেছে সে। একেবারে মাথার ওপর এসে গেছে বিপদ।

মার্চ ১৩। কৌবোর পাঁচ মাইলের মধ্যে এসে গেছে অভিযাত্রীরা। টোনগানে জানাল আর মাইলখানেক গেলেই পাওয়া যাবে ক্যাপ্টেন ব্লেজনের কবর।

উত্তেজনায় অধীর হয়ে পথ চলছে সবাই। কিন্তু গতি ধীর হয়ে পড়ছেই। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাহিল শরীর নিয়ে তাড়াতাড়ি করা যায় না।

বিকেলের দিকে একটা শুয়োর মারতে পারলেন ফ্লোরেন্স। রাতের দিকে সবাইকে অবাক করে দিয়ে বৃষ্টিও নামল হঠাৎ। অতি সামান্য হলেও পানি ধরে রাখতে পারল অভিযাত্রীরা।

অনেক দিন পরে পেট ভরে খেল সবাই। অনেকখানি বল ফিরে এল শরীরে।

মাঝরাতে একটা সন্দেহজনক শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল ফ্লোরেন্সের। আস্তে করে উঠে বসলেন, হালকা চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে বনভূমি আর ঘাসজমিতে। উত্তর-পুবে প্রায় একশো গজ দূরে দলটাকে দেখতে পেলেন তিনি। চলে যাচ্ছে। গুনলেন, তেইশ জন। চকিতে সন্দেহ উঁকি দিল মনে, ল্যাকোর আর তার দলবল নয় তো?

সকালে ব্যাপারটা দলের সবাইকে জানালেন ফ্লোরেন্স। এখন করণীয় কি? আলোচনায় বসল সবাই। অনুমান করল তারা, শেষ রাতে গেছে, আজই রাতে আক্রমণ করবে ওরা; সুতরাং আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। কিন্তু তার আগে ক্যাপ্টেন ব্লেজনের কবরটা দেখা দরকার।

ছ'টায় রওনা দিল অভিযাত্রীরা। উত্তেজনায় অধীর সবাই; বার বার তাকাচ্ছে টোনগানের দিকে। কোন একটা মাটির ঢিবি দেখলেই জিজ্ঞেস করছে, ওটা? ওইটাই?

শেষ পর্যন্ত একটা জায়গার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল টোনগানে, 'ওই যে, এসে গেছি।'

সবাই তাকাল তার নির্দেশিত জায়গার দিকে। কিন্তু কোথায় কবর? একটা গাছ শুধু দেখা যাচ্ছে।

গাছটার কাছে এসেই থেমে দাঁড়াল টোনগানে। কোমর থেকে ছুরি খুলে নিয়ে এক জায়গার মাটি খুঁড়তে লাগল। হাত লাগালেন সেন্ট বেরেন আর ফ্লোরেন্সও।

ছুরি দিয়ে শক্ত মাটি খুঁড়তে যথেষ্ট অসুবিধা হচ্ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেল ওরা।

একজন মানুষের কঙ্কাল। জায়গায় জায়গায় খসে পড়েছে হাড়।

কাছে গিয়ে ঝুঁকে বসলেন ডাক্তার। তাঁর পাশেই ধপাস করে মাটিতে বসে পড়ল জেন। বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল কঙ্কালটার দিকে।

কঙ্কালের ডান বাহুতে পেঁচিয়ে আছে সোনালি সুতো। অফিসারের ব্যাজের এই অবস্থা হয়েছে মাটির তলায় থেকে থেকে।

বুকের ওপর পড়ে আছে একটা মানিব্যাগ, জীর্ণ হয়ে গেছে। আস্তে করে ব্যাগটা তুলে নিল জেন। খুলে দেখল খুচরো কিছু টাকা আর ভেতরের পকেটে একটা চিঠি।

চিঠিটা খুলল জেন। একেবারে জীর্ণ হয়ে গেছে কাগজ। একটু জোরে চাপ লাগতেই ভেঙে যাচ্ছে। তবু যতটা পারা গেল আস্ত রাখার চেষ্টা করল সে। চিনতে পারল। সে-ই অনেকদিন আগে লিখেছিল ভাইয়ের কাছে। তারপর আর পারল না জেন। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

সবাই চুপ, স্থির হয়ে আছে, কারও মুখে কোন কথা নেই। শুধু হাওয়া যেন হু হু করে কেঁদে কেঁদে যাচ্ছিল।

কতক্ষণ কেটে গেল বলতে পারবে না অভিযাত্রীরা। এক সময় মুখ তুলে চাইল জেন। ডাক্তারকে বলল, 'কঙ্কালটা একটু পরীক্ষা করে দেখবেন, ডক্টর? কি করে মারা গেল?'

'নিশ্চয়ই।' হাত লাগালেন ডাক্তার।

আবার নীরবতা। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল সবাই।

ঠিক দশ মিনিট পরে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার। রায় ঘোষণা করলেন, 'ক্যাপ্টেন ব্লেজন গুলিতে মারা যাননি। পেছন থেকে ছোরা মেরে খুন করা হয়েছে। বাঁটটা নিশ্চয় কাঠের ছিল, নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু ফলাটা এখনও আটকে আছে পাঁজরার হাড়ে। ঠিক হার্টে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল ছোরা।'

'খুন!' অস্ফুটকণ্ঠে বলল জেন। জোরে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে সে।

'হ্যাঁ, খুন।' জবাব দিলেন ডাক্তার।

'পেছন থেকে?'

'পেছন থেকে।'

'ভাইয়া তাহলে নিরপরাধ?'

'তা জানি না। তবে উনি ছোরার ঘায়ে মারা গেছেন, আর্মি রাইফেল কিংবা বেয়োনেটের খোঁচায় নয়।'

'একটা ডেথ সার্টিফিকেট দেবেন দয়া করে?'

'কেন দেব না? একশোবার দেব। কিন্তু একটা কাগজ।'

'এই যে, এই নিন কাগজ।' নোটবইয়ের পাতা ছিঁড়ে বাড়িয়ে ধরলেন পর্সি।

নিজের কলমটাও দিলেন।

সার্টিফিকেট লিখে দিলেন ডক্টর চাতোন্নে। উপস্থিত সবাই তাতে সাক্ষী হিসেবে সই করে দিলেন। কঙ্কালের পাঁজরা থেকে ছোরাটা বের করে নিলেন ডাক্তার। তারপর সার্টিফিকেট আর ফলাটা দিয়ে দিলেন জেন ব্লেজনকে।

কি মনে করে কবরের কাছে গিয়ে বসলেন আবার ফ্লোরেন্স। খুঁজতে লাগলেন কি যেন। খানিকক্ষণ হাতড়েই পেয়ে গেলেন জিনিসটা। ছোরার বাঁট। ভেঙে পড়ে আছে। অনেকখানিই মাটিতে খেয়ে ফেলেছে কিন্তু লোহাকাঠের বাঁট একেবারে খেয়ে ফেলতে পারেনি।

বাঁটটা নিয়ে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করলেন ফ্লোরেন্স। তারপর চোখের সামনে তুলে পরীক্ষা করে দেখলেন; যা অনুমান করেছিলেন তাই, খোদাই করা আছে বাঁটে।

'খুনীর নাম আছে?' জিজ্ঞেস করল জেন।

'মনে হচ্ছে।' আরও খুঁটিয়ে দেখলেন ফ্লোরেন্স, 'কিন্তু পড়া যাচ্ছে না ভালমত, শুধু দুটো অক্ষর ছাড়া। ইংরেজি আই, এবং আর। আর সব ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে গেছে।'

'কিন্তু এই দুটো অক্ষর থেকে তো খুনীর হদিস পাওয়া যাবে না,' বললেন বারজাক।

'এই দুটো অক্ষরের সূত্র ধরেই পিশাচটাকে খুঁজে বের করব আমি,' দৃঢ় গলায় বলল জেন।

আবার মাটি চাপা দেয়া হলো কঙ্কালটিকে। ওপরে বুনো ফুল ছিটিয়ে দিল জেন। তারপর ঘুরে দাঁড়াল।

নীরবে আবার কৌবোর দিকে রওনা দিল অভিযাত্রীরা। দুপুরের আগে ঘাসভূমি থেকে একটা তিতির আর দুটো বাস্টার্ড মারলেন ফ্লোরেন্স। আগের দিনের শুয়োরের মাংসও ছিল খানিকটা, পানিও আছে। তাই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আর কাতর হলেন না তাঁরা।

বিকেল হলো, তারপর সাঁঝ; সাঁঝ গড়িয়ে রাত। আসল বিপদ দেখা দেবে আর একটু পরেই অভিযাত্রীরা নিশ্চিত। তাই খোলা জায়গায় রাত না কাটিয়ে ঘন জঙ্গল বেছে নিলেন তাঁরা। এক পাশে পাহাড়।

একে একে ঘুমিয়ে পড়ল সবাই, কিন্তু ঘুম এল না ফ্লোরেন্সের চোখে। কিছুর অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি। রাত এগারোটা নাগাদ দেখতে পেলেন মশালের আলো। সার বেঁধে এগিয়ে আসছে এদিকেই, উত্তর থেকে।

আস্তে করে ঠেলা মেরে পাশে শোয়া টোনগানেকে জাগালেন ফ্লোরেন্স। টোনগানেও নীরবে দেখল ক্রম অগ্রসরমান আলোর সারি। একে একে সবাইকে তুললেন ফ্লোরেন্স আর টোনগানে।

ঠিক এই সময়ে শোনা গেল সেই রহস্যময় শব্দ। প্রচণ্ড গর্জনে পাহাড়-বন কাঁপিয়ে পুবদিক থেকে এগিয়ে আসছে। দেখতে দেখতে মাথার ওপরে এসে গেল শব্দ। হঠাৎই গোটা বনভূমি আলোয় আলোকিত করে জ্বলে উঠল তীব্র আলো। মাথার ওপরে শব্দের উৎস থেকেই আসছে আলোটা, কয়েকটা সার্চ লাইট যেন জ্বলে উঠেছে এক সঙ্গে।

ওদিকে অভিযাত্রীদের ঘিরে ধরেছে মশালধারীরা, এগিয়ে আসছে আরও।

মশালধারীদের পেছন থেকে কথা বলে উঠল কেউ ফরাসী ভাষায়, 'সব ক'জনই আছে তো?'

'আছে,' উত্তর দিল একজন মশালধারী।

'ঠিক আছে, নিয়ে চলো।'

'এসো সবাই।' অভিযাত্রীদের ডাকল মশালধারীদের সর্দার। 'সাবধান। একটু গোলমাল করলে মাথার খুলি উড়ে যাবে।'

বিকট চেহারার লোকটা তার হাতের রিভলভার তুলে দেখাল।

****